মুসলিম জাতির ইতিহাস

মুসলিম জাতির ইতিহাস

(১-২ খণ্ড)

ড. সুহাইল তাক্কুশ

সাআদ হাসান
মাহমুদ সিদ্দিকী
অনূদিত

চেতনা

বই	:	মুসলিম জাতির ইতিহাস (১-২ খণ্ড)
মূল	:	ড. সুহাইল তাক্কুশ
অনুবাদ	:	সাআদ হাসান, মাহমুদ সিদ্দিকী
নিরীক্ষণ	:	মাহমুদ সিদ্দিকী
প্রকাশকাল	:	মে ২০২২/শাওয়াল ১৪৪৩
প্রকাশনা	:	২১
পৃষ্ঠাসজ্জা	:	আবু আফিফ মাহমুদ
বানান সমন্বয়	:	মুহিব্বুল্লাহ মামুন
প্রকাশক	:	বোরহান আশরাফী চেতনা প্রকাশন দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা) ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক	:	মাকতাবাতুল আমজাদ, ফোন : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৩৫
অনলাইন পরিবেশক	:	উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, পরিধি

মূল্য : ১২০০.০০৳

Muslim Jatir Itihas by Dr. Suhail Tqwsh. Translated by Saad Hasan, Mahmud Siddiqui, Edited by Mahmud Siddiqui,
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

অর্পণ

মরহুম আব্বার মাগফিরাত কামনায়
আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন
এবং
পরম মমতাময়ী আম্মার সুস্বাস্থ্য কামনায়
আল্লাহ তাঁর নেক হায়াতকে আমাদের ওপর দীর্ঘায়ত করুন।

—সাআদ হাসান

প্রথম খণ্ড

সূচি

অনুবাদকের কথা.....১৯
লেখকের কথা ২৩

প্রথম অধ্যায়

জাহেলি যুগ

পূর্বকথন ৩১
ভৌগোলিক পরিবেশ ৩১
ভৌগোলিক অবস্থান.....৩২
গঠন ও অবকাঠামোগত অবস্থা ৩২
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৩৫

আরব জাতিসমূহ ৩৭

ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা ৩৮
অর্থনৈতিক অবস্থা ৩৮
সামাজিক অবস্থা.....৪১
ধর্মীয় অবস্থা..... ৪৬
ক. শিরকের প্রকাশ..... ৪৬
খ. তাওহিদমুখিতা ৪৭
শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যচর্চার হালহাকিকত ৫০

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৫৩
প্রাককথন ৫৩

হিজাজের শাসনব্যবস্থা ৫৪

মক্কা ৫৪
ইয়াসরিব ৬০
তায়েফ ৬১

উত্তর দিকের সাম্রাজ্যসমূহ ৬১
আম্বাত সাম্রাজ্য (Nabataean Kingdom) ৬১
তাদমুর সাম্রাজ্য (Palmyrene Empire) ৬২
গাসসানি সাম্রাজ্য (Ghassanid Kingdom) ৬৫

দক্ষিণ অংশের সাম্রাজ্যসমূহ ৬৯
মুইনিয়া সাম্রাজ্য (১৩০০-৬৩০ খ্রিষ্টপূর্ব) ৬৯
সাবা সাম্রাজ্য (৮০০-১১৫ খ্রিষ্টপূর্ব) ৭০
হিমইয়ারি সাম্রাজ্য ৭১
পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থা ৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নববি যুগ

মক্কা-পর্ব

নবুওয়তপূর্ব সময় ৭৭
নবুওয়তলাভ ৮০
নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরত ..৮৩
মক্কি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ৮৫

মদিনা-পর্ব

ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি ৮৭

মসজিদ নির্মাণ ৮৭
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি ৮৮
সাংবিধানিক চুক্তিপত্র ৮৮
প্রথম দিকের গাযওয়া-সারিয়্যা ৯০
বদর যুদ্ধ ৯২
বদর যুদ্ধের পরিশিষ্ট ৯৪

উহুদ যুদ্ধ.....৯৬
উহুদ যুদ্ধের পরিশিষ্ট ৯৯
খন্দকের যুদ্ধ (গাযওয়াতুল আহযাব) ১০০
খন্দক যুদ্ধের পরিশিষ্ট ১০১
মদিনাা অবরোধপরবর্তী যুদ্ধসমূহ.....১০২
হুদায়বিয়ার সন্ধি ১০৩
বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট নবীজির পত্র প্রেরণ ১০৫
খায়বার যুদ্ধ.....১০৫
মুতার যুদ্ধ..... ১০৬
মক্কা বিজয়.....১০৭
হুনাইনের যুদ্ধ ১০৭
তায়েফের যুদ্ধ..... ১০৮
তাবুক যুদ্ধ ১০৮
ওফাত ১০৯

তৃতীয় অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদার যুগ

(১১-৪০ হি./৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

আবু বকর সিদ্দিক রাযি. (১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি.).....১১৩
খেলাফত প্রসঙ্গ.....১১৩
নবীজির ওফাত-পরবর্তী মদিনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি : আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-কে নির্বাচিতকরণ ১১৩

আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিসমূহ ১১৫
উসামা বিন যায়দের বাহিনী প্রেরণ ১১৫

(রিদ্দাহ) ধর্মত্যাগের যুদ্ধ..... ১১৫
ধর্মত্যাগের কারণসমূহ ১১৫
মুরতাদদের মোকাবেলা ১১৯
জাজিরাতুল আরবের সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার.....১২০
বিজয়াভিযানের কার্যকারণসমূহ ১২০

ইরাক বিজয়ের সূচনা ১২৪
জাতুস সালাসিলের যুদ্ধ ১২৪
প্রাথমিক বিজয়সমূহ ১২৪

সিরিয়া বিজয়ের সূচনা ১২৬
প্রাথমিক সংঘাতসমূহ..... ১২৬
আজনাদাইন বা ইয়ারমুকের যুদ্ধ.....১২৭
আবু বকর রাযি.-এর মৃত্যু.....১২৯

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.).....১৩১
উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর কাছে বাইআত ১৩১

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর যুগে ইসলামের বিজয়ের পূর্ণতা. ১৩২
পারস্য অভিযান ১৩২
সেতুর যুদ্ধ ১৩২
বুওয়াইব যুদ্ধ ১৩৩
কাদিসিয়্যার যুদ্ধ ১৩৪
মাদায়েন বিজয় ১৩৫
জালুলা ও হুলওয়ান বিজয়..... ১৩৭৫
আহওয়াজ বিজয়.....১৩৬
নাহাওয়ান্দ (Nahavand) যুদ্ধ ১৩৬

সিরিয়া অভিযান ১৩৭
ফাহল, দামেশক ও হিমস বিজয় ১৩
ইয়ারমুক যুদ্ধ ১৩৮
সিরিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল বিজয়.....১৩৮
আমওয়াসের প্লেগ..... ১৩৯
মেসোপটেমিয়া বিজয় ১৪০

মিসর অভিযান ১৪০
মিসর বিজয়ের কারণসমূহ.....১৪০
বেবিলনের দুর্গ বিজয়.....১৪২
ইস্কান্দারিয়া (Alexandria) বিজয়..... ১৪৪
পশ্চিম প্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তার ১৪৫

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর যুগে রাষ্ট্রীয় কাঠামো..... ১৪
রাজনৈতিক-ব্যবস্থাপনা.....১৪৫
বিচারব্যবস্থা.....১৪৬
দফতর স্থাপন.....১৪৬
প্রশাসননীতি.....১৪৭
উমর রাযি.-এর মৃত্যু.....১৪৮

উসমান বিন আফফান রাযি. (২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.).....১৪৯
উসমান বিন আফফান রাযি.-এর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ.....১৪৯
উসমান বিন আফফান রাযি.-এর যুগে বিজয়সমূহ ১৫২
ইসলামি সাম্রাজ্যে অরাজকতার কারণসমূহ.....১৫৩
নৈরাজ্য সৃষ্টি ও উসমান রাযি.-কে হত্যা.....১৫৭

আলি ইবনে আবু তালেব রাযি. (৩৬-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি.).১৬৩
আলি রাযি.-এর হাতে বাইআত ১৬৩
আলি রাযি.-এর সর্বজনীন রাজনীতি ১৬৫
জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) ১৬৭

সিফ্ফিন যুদ্ধ.....১৭০
আলি রাযি.-এর হত্যাকাণ্ড.....১৭০

চতুর্থ অধ্যায়

উমাইয়া বংশের শাসনামল

(৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

উমাইয়া খলিফাবৃন্দ ১৭৬

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. (৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৮০ খ্রি.)১৭৭
উমাইয়া বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা.....১৭৭
মুআবিয়া রাযি.-এর রাষ্ট্রনীতি.....১৭৮
মুআবিয়া রাযি.-এর যুগে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ..১৭৯
খারেজিদের আন্দোলন.....১৭৯
আলাভিদের আন্দোলন.....১৭৯
ইয়াযিদের পক্ষে খেলাফতের বাইআত ১৮০

মুআবিয়া রাযি.-এর পররাষ্ট্রনীতি ১৮১
পূর্ব দিকের অভিযান.....১৮১
পশ্চিম দিকের অভিযান ১৮১
উত্তর আফ্রিকা অভিযান ১৮৩
মুআবিয়া রাযি.-এর প্রশাসন-নীতি.....১৮৪
মুআবিয়া রাযি.-এর মৃত্যু.....১৮৪

ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া (৬০-৬৪ হি./৬৮০-৬৮৩ খ্রি.) ১৮৫
ইয়াযিদের হাতে বাইআত ১৮৫
ইয়াযিদের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি ১৮৫
কারবালা ট্রাজেডি ১৮৫
মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ : হাররার যুদ্ধ ১৮৮
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর বিদ্রোহ..... ১৮৯
ইয়াযিদের শাসনামলে বৈদেশিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি ১৯
ইয়াযিদের মৃত্যু ১৯২

মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদ : দ্বিতীয় মুআবিয়া (৬৪ হি./৬৮৪ খ্রি.) ১৯৩

মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৪-৬৫ হি./৬৮৪-৬৮৫ খ্রি.) ১৯৫

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি./৬৮৫-৭০৫ খ্রি.).. ১৯৬
আবদুল মালিকের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ১৯৬
আবদুল মালিকের যুগে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি..... ১৯৬
তাওয়াবিনদের যুদ্ধ ১৯৬
মুখতার বিন আবু উবাইদ সাকাফির যুদ্ধ ১৯৭
যুবায়ের পুত্রদ্বয়ের যুদ্ধ..... ১৯৮
খারেজিদের দমন ১৯৮
ইবনুল আশআসের বিদ্রোহ..... ১৯৯
আবদুল মালিকের পররাষ্ট্রনীতি ২০০
আবদুল মালিকের প্রশাসননীতি.....২০১
আবদুল মালিকের মৃত্যু ২০৩

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক (৮৬-৯৬ হি./৭০৫-৭১৫ খ্রি.)..... ২০৪
ওয়ালিদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ২০৪

মাওয়ারা-উন-নাহরের দেশগুলো বিজয় ২০৪
সিন্ধু বিজয় ২০৫
বাইজেন্টাইনের অভিযান ২০৬
উত্তর আফ্রিকার অভিযান ২০৬
ওয়ালিদের মৃত্যু ২০৭

সুলাইমান বিন আবদুল মালিক (৯৬-৯৯হি./৭১৫-৭১৭ খ্রি.) ২০৮

সুলাইমানের স্বরাষ্ট্রনীতি ২০৮

সুলাইমানের পররাষ্ট্রনীতি ২০৯
পূর্ব দিকের অভিযান ২০৯
বাইজেন্টাইন অভিযান ২০৯
সুলাইমানের মৃত্যু ২১০

উমর বিন আবদুল আজিজ (৯৯-১০১ হিজরি/৭১৭-৭২০ খ্রি.) ২১১
উমর বিন আবদুল আজিজের শাসননীতি ২১১
উমর বিন আবদুল আজিজের মৃত্যু ২১২

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক (দ্বিতীয় ইয়াযিদ) (১০১-১০৫ হি./৭২০-৭২৪ খ্রি.) ২১৩

দ্বিতীয় ইয়াযিদের যুগে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ২১৩
ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের বিদ্রোহ ২১৩
আব্বাসীয় অভ্যুত্থান ২১৩
ইয়াযিদের পররাষ্ট্রনীতি ২১৪
ইয়াযিদের মৃত্যু ২১৪

হিশাম বিন আবদুল মালিক (১০৫-১২৫ হি./৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) ২১৫
হিশামের যুগে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ২১৫

হিশামের যুগে বৈদেশিক পরিস্থিতি ২১৭
পূর্ব দিকে অভিযান ২১৭
আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের অভিযান ২১৭
বাইজেন্টাইনের অভিযান ২১৭
উত্তর আফ্রিকার অভিযান ২১৮

হিশামের মৃত্যু ২১৮

ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ (দ্বিতীয় ওয়ালিদ) (১২৫-১২৬ হি./৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.)
.....২১৯

ইয়াযিদ বিন প্রথম ওয়ালিদ (১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.).....২২১

মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আল-জাদি (১২৭-১৩২হি./৭৪৪-৭৫০ খ্রি.)
..... ২২২

উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণসমূহ ২২৪
ভূমিকা..... ২২৪
এক. উমাইয়া পরিবারের দ্বন্দ্ব ২২৫
দুই. দুজনকে যুবরাজ ঘোষণা করা.....২২৮
তিন. গোত্রীয় দ্বন্দ্ব.....২২৯
চার. উমাইয়াদের নিকট আরব জাতীয়তাবাদ.....২২৯
পাঁচ. আদর্শিক দ্বন্দ্ব ২৩১

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি শাসনামল

আব্বাসিদের প্রথম যুগ

(১৩২-২৩২ হি./৭৫০-৮৪৭ খ্রি.)

আব্বাসিদের প্রথম যুগের খলিফাগণ ও তাদের শাসনকাল..... ২৩৪
এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি ২৩৫
আব্বাসি খেলাফতের প্রতিষ্ঠা.....২৩৫
আব্বাসি খেলাফতের সাধারণ নীতি.....২৩৬
আব্বাসি শাসনকালের শ্রেণিবিন্যাস.....২৩৬

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস-সাফফাহ (১৩২-১৩৬ হি./৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)
.....২৩৭
সাফফাহি যুগের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি..... ২৩৭

সাফফাহি যুগের বৈদেশিক পরিস্থিতি ২৩৭

পূর্ব দিকের ফ্রন্ট ২৩৭
বাইজেন্টাইন ফ্রন্ট ২৩৮
সাফফাহি যুগের মন্ত্রণালয় ২৩৮
আস-সাফফাহের মৃত্যু ২৩৯

আবদুল্লাহ আবু জাফর মানসুর (১৩৬-১৫৮ হি./৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) ২৪০

মানসুরের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ২৪০
আবদুল্লাহ বিন আলির অবাধ্যতা ২৪০
আবু মুসলিম খোরাসানির পরিণতি ২৪০
আবু মুসলিমের হত্যা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ২৪১
আলাভিদের সঙ্গে সম্পর্ক ২৪১

মানসুরের যুগে বৈদেশিক পরিস্থিতি ২৪২
বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক ২৪২
বাগদাদ শহর নির্মাণ ২৪২
মানসুরের মৃত্যু ২৪৩

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ মাহদি (১৫৮-১৬৯হি./৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) ২৪৪
মাহদির সংস্কারকর্ম ২৪৪

মাহদির শাসনামলে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনসমূহ ২৪৫
ধর্মদ্রোহীদের আন্দোলন ২৪৫
মুকান্নার আন্দোলন ২৪৫
বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে সম্পর্ক ২৪৬
মাহদির মৃত্যু ২৪৬

আবু মুহাম্মাদ মুসা আল-হাদি (১৬৯-১৭০ হি./৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.) .২৪৭
হাদির মৃত্যু ২৪৭

আবু জাফর হারুনুর রশিদ (১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ২৫৮
রশিদের গুণাবলি ২৫৮

রশিদের যুগে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ২৪৮
আলাভিদের সাথে সম্পর্ক ২৪৮

খারেজিদের আন্দোলন ২৪৯
উত্তর আফ্রিকার অরাজকতা ২৪৯
পূর্ব দিকের অরাজকতা ২৫০
বারমাকিদের বিপর্যয় ২৫০

রশিদের শাসনামলে বৈদেশিক সম্পর্ক ২৫২
বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক ২৫২
ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে সম্পর্ক ২৫৩
রশিদের মৃত্যু ২৫৩

আবু মুসা মুহাম্মাদ আল-আমিন (১৯৩-১৯৮ হি./৮০৯-৮১৩ খ্রি.) ২৫৫
আমিন ও মামুনের মধ্যে বিরোধের কারণসমূহ ২৫৫
যুবরাজ-বিষয়ক জটিলতা ২৫৫
আরব ও পারসিকদের মধ্যকার বর্ণবিরোধ ২৫৫
আশপাশের লোকদের প্ররোচনা ২৫৬
দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত ২৫৬

আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) **..... ২৫৮**
খলিফা মামুনের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ২৫৮

মামুনের শাসনামলে সরকারবিরোধী আন্দোলনসমূহ ২৫৯
আলাভি আন্দোলন ২৫৯
আলাভি ছাড়াও অন্যদের আন্দোলন ২৬১
মামুনের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য ২৬২
বাইজেন্টাইনদের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৬২
মামুনের মৃত্যু ২৬৩

আবু ইসহাক মুহাম্মাদ আল-মুতাসিম (২১৮-২২৭ হি./৮৩৩-৮৪১ খ্রি.) ২৬৪
মুতাসিমের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ২৬৪
তুর্কি জাতীয়তাবাদের উত্থান ২৬৪
বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৬৫

আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক (২২৭-২৩২ হি./৮৪১-৮৪৭ খ্রি.)
..... ২৬৭

আব্বাসি শাসনের দ্বিতীয় যুগ

(২৩২-৩৩৪ হি./৮৪৭-৯৪৫ খ্রি.)

তুর্কি আধিপত্যের যুগ ২৭০
আব্বাসি শাসনের দ্বিতীয় যুগের খলিফাগণ ও তাদের প্রত্যেকের শাসনকাল২৭০
এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি ২৭১
অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি.....২৭১
তুর্কিদের সাথে সম্পর্ক ২৭১
মুতাওয়াক্কিলের খেলাফত ২৭২
মুনতাসিরের খেলাফত ২৭২
মুসতাইনের খেলাফত ২৭৩
মু'তাজের খেলাফত.....২৭৩
মুহতাদির খেলাফত.....২৭৩
মু'তামিদের খেলাফত ২৭৪
মুতাজিদের খেলাফত.....২৭৪
মুকতাফির খেলাফত.....২৭৪
মুকতাদিরের খেলাফত ২৭৫
কাহেরের খেলাফত ২৭৫
রাজির খেলাফত : আমিরুল উমারার প্রথা চাল..... ২৭৫
মুত্তাকির খেলাফত ২৭৬
মুস্তাকফির খেলাফত ২৭৭
যানজদের আন্দোলন ২৭৭
আলাভিদের সাথে সম্পর্ক.....২৮০
বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক..... ২৮১
তাহেরি সাম্রাজ্য (২০৫-২৫৯ হি./৮২০-৮৭৩ খ্রি.).....২৮
সাফফারি সাম্রাজ্য (২৫৪-২৯৮ হি./৮৬৮-৯১১ খ্রি.) ২৮২
সামানি সাম্রাজ্য (২৬১-৩৮৯ হি./৮৭৪-৯৯৯ খ্রি.)..... ২৮৪
তুলুনি সাম্রাজ্য (২৫৪-২৯২ হি./৮৬৮-৯০৫ খ্রি.) ২৮৬

ইখশিদি সাম্রাজ্য (৩২৩-৩৫৮ হি./৯৩৫-৯৬৯ খ্রি.).....২৮৯
মসুল ও আলেপ্পোতে হামদানি শাসন ২৯১

আব্বাসি শাসনের তৃতীয় যুগ

(৩৩৪-৪৪৭ হি./৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)

বুওয়াইহি আধিপত্যের যুগ ২৯৬
আব্বাসি শাসনের তৃতীয় যুগের খলিফাগণ ও তাদের শাসনকাল ২৯৬
এ যুগের সার্বিক অবস্থা ২৯৭
বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন..... ২৯৭
বুওয়াইহিদের সঙ্গে আব্বাসি খেলাফতের সম্পর্ক.....২৯৮
বুওয়াইহিদের অবসান.....২৯৯

আব্বাসি শাসনের চতুর্থ যুগ

(৪৪৭-৬৫৬ হি./১০৫৫-১২৫৮ খ্রি.)

সেলজুকি তুর্কিদের আধিপত্যের যুগ ৩০২
আব্বাসি শাসনের চতুর্থ যুগের খলিফাগণ ও তাদের শাসনকাল .৩০২
এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি ৩০৩
সেলজুকি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা.....৩০৩
আব্বাসি খেলাফত ও সেলজুকি সাম্রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্ক ৩০৪
সেলজুকদের পতন ৩০৫

আব্বাসি খেলাফতের শেষ অধ্যায় (৫৯০-৬৫৬ হি./১১৯৪-১২৫৮ খ্রি.)
.....৩০৯
আতাবেকি সাম্রাজ্য ৩০৯
ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় পূর্ব আরবের ইসলামি বাহিনী ৩০৯
জেনগি ও ক্রুসেডার.....৩১১
আইয়ুবি ও ক্রুসেডার ৩১৪
মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতন..... ৩১৯

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচিপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্দালুসীয় যুগ

(৯৫-৮৯৭ হি./৭১৪-১৪৯২ খ্রি.)

উমাইয়া গভর্নরদের যুগ

(৯৫-১৩৮ হি./৭১৪-৭৫৬ খ্রি.)

উমাইয়া শাসনের যুগ

(১৩৮-৩০০ হি./৭৫৬-৯১২ খ্রি.)

ভূমিকা ১৩
ইসলামের বিজয়ের পূর্বে আন্দালুসের অবস্থা ১৩
রাজনৈতিক পরিস্থিতি..... ১৩
সামাজিক পরিস্থিতি ১৩
বিজয়াভিযান.....১৪
আন্দালুসীয় ইতিহাসের শ্রেণিবিন্যাস ১৭
১. উমাইয়া গভর্নরদের যুগ : (৯৫-১৩৮ হি./৭১৪-৭৫৬ খ্রি.) ১৭
২. উমাইয়া শাসনের যুগ : (১৩৮-৩০০ হি./৭৫৬-৯১২ খ্রি.).... ১৮
৩. উমাইয়া খেলাফতের যুগ : (৩০০-৪২২ হি./৯১২-১০৩১ খ্রি.)১৮
৪. সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজত্যের যুগ : (৪২২-৮৯৭ হি./১০৩১-১৪৯২ খ্রি.)
.....১৮
ইসলামের বিজয়ের পর আন্দালুসের সামাজিক অবস্থা ১৯
আন্দালুসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি..... ২০
বৈদেশিক পরিস্থিতি ২৯
আন্দালুসের উমাইয়া শাসকগণের নাম ও তাদের শাসনকাল.....৩৬

প্রথম আবদুর রহমান (১৩৮-১৭২ হি./৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)..... ৩৭
আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান..... ৩৭
আবদুর রহমান আদ-দাখিল যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন.....৩৯
প্রথম চ্যালেঞ্জ.....৩৯
দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ৪০
তৃতীয় চ্যালেঞ্জ ৪১
বৈদেশিক পরিস্থিতি..... ৪২
প্রথম হিশাম (আর-রেযা) (১৭২-১৮০ হি./৭৮৮-৭৯৬ খ্রি.).....৪৩
প্রথম হাকাম (আর-রাবাযি) (১৮০-২০৬ হি./৭৯৬-৮২২ খ্রি.) ৪৫
বৈদেশিক পরিস্থিতি.....৪৭
দ্বিতীয় আবদুর রহমান (২০৬-২৩৮ হি./৮২২ খ্রি.) ৪৯
অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি..... ৪৯
বৈদেশিক পরিস্থিতি (উত্তরে স্পেনিশ দাসদের সাথে সম্পর্ক) ৫১
নর্মানদের সাথে সম্পর্ক ৫২
বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক ৫৩
নাগরিক জীবনের চিত্র..... ৫৪
দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু.....৫৫
দ্বিতীয় আবদুর রহমান পরবর্তী শাসকগণ.....৫৬
অস্থিতিশীল কেন্দ্রীয় শাসন.....৫৬

সপ্তম অধ্যায়

আন্দালুসীয় যুগ

উমাইয়া খেলাফতের যুগ

(৩০০-৪২২ হি./৯১২-১০৩১ খ্রি.)

বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজত্বের যুগ

(৪২২-৮৯৭ হি./১০৩১-১৪৯২ খ্রি.)

আন্দালুসের উমাইয়া খলিফাদের নাম ও তাদের শাসনকাল ৬০
তৃতীয় আবদুর রহমান : আন-নাসের (৩০০-৩৫০ হি./৯১২-৯৬১ খ্রি.)
..... ৬১

তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনক্ষমতা গ্রহণ ৬১
অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ৬১
রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধার ৬১
উমাইয়া খেলাফতের পুনর্জাগরণ ৬৩
বৈদেশিক পরিস্থিতি (উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিদের সাথে সম্পর্ক) ৬৪
উত্তরাঞ্চলের স্পেনিশ রাজ্যসমূহের সাথে সম্পর্ক ৬৬
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক ৬৮
আবদুর রহমান আন-নাসেরের নগরোন্নয়ন ও কীর্তিসমূহ ৬৯
আবদুর রহমান আন-নাসেরের মৃত্যু ৭১
দ্বিতীয় হাকাম : 'আল-মুস্তানসির বিল্লাহ' (৩৫০-৩৬৬হি./৯৬১-৯৭৭ খ্রি.) ৭২
আল-মুস্তানসিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৭২
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ৭২
উত্তরাঞ্চলের স্পেনিশ রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক ৭২
মরক্কোয় বার্বারদের (আমাজিগ) সঙ্গে সম্পর্ক ৭৩
আল-মুস্তানসিরের শাসনামলে জ্ঞানচর্চা ৭৫
আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের শেষ যুগ (৩৬৬-৪২২হি./৯৭৭-১০৩১ খ্রি.) ৭৭
আমেরি পরিবারের শাসন : মুহাম্মাদ বিন আবু আমের আল-মানসুর .. ৭৮
ক্ষমতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ৭৮
মুহাম্মাদ বিন আবু আমের কর্তৃক সেনাবহিনীর শক্তিবৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ ৭৯
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৭৯
উত্তরাঞ্চলের স্পেনিশ রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক ৭৯
মরক্কোর সাম্রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক ৮০
মুহাম্মাদ বিন আবু আমেরের মৃত্যু ৮০
আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আবু আমের আল-মানসুর 'আল-মুজাফ্ফর' ৮১
আবদুর রহমান বিন মানসুর ৮২
উমাইয়া খেলাফতের শেষ যুগ ৮৩
সম্প্রদায়ভিত্তিক সাম্রাজ্যের যুগ (৪২২-৮৯৭ হি./১০৩১-১৪৯২ খ্রি.) ৮৬

সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজাদের শাসন (৪২২-৪৭৯ হি./১০৩১-১০৮৬ খ্রি.) ৮৭
মরক্কোর আধিপত্যের যুগ (৪৭৯-৬১২ হি./১০৮৬-১২১৫ খ্রি.) .৯১
স্পেনিশ সাম্রাজ্যসমূহ.....৯১
আন্দালুসে মুরাবেতিদের আগমন ৯১
মুরাবেতিদের প্রথম হামলা : জাল্লাকা যুদ্ধ.....৯১
মুরাবেতিদের দ্বিতীয় হামলা : লেইট ফোর্টের যুদ্ধ ৯৩
আন্দালুসে মুরাবেতিদের অবসান..... ৯৭
আন্দালুসে মুওয়াহহিদদের আগমন..... ৯৭
বনু নাসর বা বনুল আহমারের শাসন (৬১২-৮৯৭ হি./১২১৫-১৪৯২ খ্রি.)১০৩
আন্দালুসে বনুল আহমারের আবির্ভাব ১০৩

অষ্টম অধ্যায়

ফাতেমি সাম্রাজ্য

(২৯৭-৫৬৭ হি./৯১০-১১৭১ খ্রি.)

ফাতেমি শাসকদের নাম ও তাদের শাসনকাল..... ১০৮
ফাতেমিদের শিকড়.....১০৯
ফাতেমি সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিভক্তি ১১৪
প্রথম ধাপ (২৯৭-৩৬২ হি./৯১০-৯৭৩ খ্রি.).....১১৬
ফাতেমি সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠার পূর্বে উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি .১১৬
মিদরারি সাম্রাজ্য বা বনি ওয়াসুল সাম্রাজ্য (১৪০-২৯৬ হি./৭৫৭-৯০৮ খ্রি.) ১১৬
রুস্তমি সাম্রাজ্য (১৪৪-২৯৬ হি./৭৬১-৯০৮ খ্রি.) ১১৯
ইদরিসি সাম্রাজ্য (১৭২-৩৫৭ হি./৭৮৮-৯৮৫ খ্রি.) ১২০
আগলাবি সাম্রাজ্য (১৮৪-২৯৬ হি./৮০০-৯০৯ খ্রি.) ১২০
ফাতেমি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা.....১২১
উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি (২৯৭-৩২২ হি./৯১০-৯৩৪ খ্রি.) ১২৩
আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল-কায়েম (৩২২-৩৩৪ হি./৯৩৪-৯৪৬ খ্রি.) ১২৫

আবু তাহের ইসমাঈল আল-মানসুর (৩৩৪-৩৪১ হি./৯৪৬-৯৫৩ খ্রি.) ১২৮
আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ (৩৪১-৩৬৫ হি./৯৫৩-৯৭৫ খ্রি.) ১২৮
দ্বিতীয় ধাপ ১৩২
রাজ্যসম্প্রসারণ ও আধিপত্য বিস্তারের যুগ (৩৬২-৪৮৭ হি./৯৭৩-১০৯৪ খ্রি.) ১৩২
মুইযের স্বরাষ্ট্রনীতি ১৩২
মুইযের পররাষ্ট্রনীতি ১৩৪
আবু মানসুর নিযার : আল-আজিজ (৩৬৫-৩৮৬হি./৯৭৫-৯৯৬খ্রি.) ১৩৭
আজিজের ব্যক্তিত্ব ১৩৭
মিসরের সুন্নি মুসলিমদের ব্যাপারে আজিজের অবস্থান ১৩৭
জিম্মিদের বিষয়ে আজিজের অবস্থান ১৩৮
আজিজের পররাষ্ট্রনীতি..... ১৩৯
আবু আলি মানসুর : আল-হাকিম (৩৮৬-৪১১ হি./৯৯৬-১০২১ খ্রি.) ১৪২
হাকিমের শাসনামলের শুরুতে মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৪২
হাকিমের শাসননীতি ১৪৪
হাকিমের ধর্মীয় ভাবনা ১৪৬
হাকিমের সমাজনীতি ১৫০
হাকিমের পররাষ্ট্রনীতি ১৫১
আব্বাসিদের সঙ্গে সম্পর্ক.....১৫১
বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক ১৫২
হাকিমের পতন.....১৫৪
আবুল হাসান আলি আয-যাহের (৪১১-৪২৭ হি./১০২১-১০৩৬ খ্রি.)১৫৭
যাহেরের শাসনক্ষমতা গ্রহণ ১৫৭
যাহেরের সাধারণ নীতি ১৫৭
ধর্মীয় চেতনা..... ১৫৮
যাহেরের পররাষ্ট্রনীতি ১৫৮
আল-মুস্তানসির বিল্লাহ (৪২৭-৪৮৭ হি./১০৩৬-১০৯৪ খ্রি.) ১৬০
অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি..... ১৬০

আল-মুস্তানসিরের পররাষ্ট্রনীতি ১৬২
মুস্তানসিরের মৃত্যু.....১৬৪
তৃতীয় ধাপ..... ১৬৫
শাসনপদ্ধতিগত ত্রুটি ও পতনের যুগ (৪৮৭-৫৬৭ হি./১০৯৪-১১৭১ খ্রি.)
.....১৬৫

নবম অধ্যায়

মামলুক আমল

(৬৪৮-৯২৩ হি./১২৫০-১৫১৭ খ্রি.)

মামলুক সুলতানগণ ও তাদের শাসনকাল ১৭৭
বাহরি মামলুকগণ ১৭৭
বুরজি মামলুকগণ.....১৭৯
বাহরি মামলুক সাম্রাজ্য (৬৪৮-৭৮৪ হি./১২৫০-১৩৮২ খ্রি.).....১৮১
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়কাল (৬৪৮-৬৫৮ হি./১২৫০-১২৬০ খ্রি.)
..... ১৮২
ভূমিকা..... ১৮২
ঐতিহাসিক শিকড়..... ১৮২
মামলুকি জাতীয়তাবাদ.....১৮৩
বাহরি মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৮৩
বাইবার্স ও তার সন্তানদের শাসনামল (৬৫৮-৬৭৮ হি./১২৬০-১২৭৯ খ্রি.)
.....১৮৮
কালাউন ও তার পরিবারের শাসনামল (৬৭৮-৭৮৪ হি./১২৭৯-১৩৮২ খ্রি.)
.....১৯২
বুরজি মামলুক সাম্রাজ্য (৭৮৪-৯২৩ হি./১৩৮২-১৫১৭ খ্রি.)..... ২০৫
বুরজি মামলুকদের অভ্যুদয় ২০৫
বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ২০৫
বারকুক ও তার প্রতিনিধিদের শাসনকাল (৭৮৪-৮২৪ হি./১৩৮২-১৪২১ খ্রি.) ২০৮
বুরজি মামলুক ইতিহাসের শেষ পর্ব (৮২৪-৯৩৩ হি./১৪২১-১৫১৭ খ্রি.)২১৫

দশম অধ্যায়

উসমানি যুগ

(৬৬৭-১৩৪৩ হি./১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.)

উসমানি সুলতানদের নাম ও তাদের শাসনকাল..... ২২২
প্রতিষ্ঠাকাল (৬৭৮-৯১৮ হি./১২৮৮-১৫১২ খ্রি.) ২২৪
ঐতিহাসিক শিকড় ২২৪
উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ২৩০
প্রথম উসমান (৬৮৭-৭২৬ হি./১২৮৮-১৩২৬ খ্রি.) ২৩১
উরখান (৭২৬-৭৬১ হি./১৩২৬-১৩৬০ খ্রি.) ২৩২
প্রথম মুরাদ (৭৬১-৭৯১ হি./১৩৬০-১৩৮৯ খ্রি.)..... ২৩৫
প্রথম বায়েজিদ (৭৯১-৮০৫ হি./১৩৮৯-১৪০৩ খ্রি.) ২৩৭
মুহাম্মাদ শালবি : প্রথম মুহাম্মাদ (৮১৬-৮২৪ হি./১৪১৩-১৪২১ খ্রি.) ২৪০
দ্বিতীয় মুরাদ (৮২৪-৮৫৫ হি./১৪২১-১৪৫১ খ্রি.) ২৪০
দ্বিতীয় মুহাম্মাদ : আল-ফাতিহ (৮৫৫-৮৮৬ হি./১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.) ২৪২
দ্বিতীয় বায়েজিদ (৮৮৬-৯১৮ হি./১৪৮১-১৫১২ খ্রি.)..... ২৪৭
শক্তিমত্তা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ (৯১৮-১০০৩ হি./১৫১২-১৫৯৫ খ্রি.) ২৪৯
প্রথম সেলিম (৯১৮-৯২৬ হি./১৫১২-১৫২০ খ্রি.) ২৫০
সাফাভিদের সাথে সম্পর্ক..... ২৫০
মামলুকদের সাথে সম্পর্ক..... ২৫১
প্রথম সুলাইমান : আল-কানুনি (৯২৬-৯৭৪ হি./১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) ২৫৪
পশ্চিম ইউরোপের সাথে সম্পর্ক ২৫৪
সাফাভিদের সাথে সম্পর্ক..... ২৫৮
উত্তর আফ্রিকায় উসমানি বাহিনী..... ২৫৯
আলজেরিয়ার অধিভুক্তি ২৫৯
তিউনিসিয়ার সংঘাত ২৬০
পশ্চিম ত্রিপোলির অধিভুক্তি..... ২৬১
ইয়েমেনের অধিভুক্তি ২৬১
সুলতান প্রথম সুলাইমানের ব্যক্তিত্ব ২৬২

দ্বিতীয় সেলিম (৯৭৪-৯৮২ হি./১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.) ২৬৩
তৃতীয় মুরাদ (৯৮২-১০০৩ হি./১৫৭৫-১৫৯৫ খ্রি.) ২৬৫

একাদশ অধ্যায়

উসমানি যুগ

(৬৮৭-১৩৪৩ হি./১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.)

দুর্বলতা বিস্তার ও পতনের যুগ (১০০৩-১৩৪২ হি./১৫৯৫-১৯২৪ খ্রি.)২৬৭
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্বলতা বিস্তারের যুগ..... ২৬৭
ভূমিকা..... ২৬৭
উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ২৬৮
জেনিসারিদের বিদ্রোহ.....২৬৮
অভ্যন্তরীণ সংস্কার..... ২৭০
জাতিগত সংকটসমূহ..... ২২
উসমানি সাম্রাজ্যের বহিঃপরিস্থিতি ২৭৩
উসমানি ও সাফাভি সম্পর্ক..... ২৭৩
অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির সঙ্গে উসমানিদের সম্পর্ক ২৭৫
উসমানি সাম্রাজ্য ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক ২৭৯
উসমানি ও ফরাসিদের মধ্যকার সম্পর্ক ২৮০

১৮৭৬ খ্রি. সালে ঘোষিত সংবিধান :
উনিশ শতকের সংস্কার, পরিবর্তন ও প্রবিধান

দ্বিতীয় মাহমুদের সংস্কার (১২২৩-১২৫৫ হি./১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি.) ২৮৪
প্রথম আবদুল মাজিদের সংস্কারকর্ম (১২৫৫-১২৭৭ হি./১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.)
.....২৮৭
গুলখানার ফরমান..... ২৮৭
হুমায়ুনলিপি : তানজিমাত বা সংস্কার কার্যাবলির ফরমান ২৮৯
আবদুল আজিজ (১২৭৭-১২৯৩ হি./১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)..... ২৯২
পঞ্চম মুরাদ (১২৯৩ হি./১৮৭৬ খ্রি.) ২৯৩
আবদুল আজিজের শাসনামল অবধি উসমানিদের সংস্কার আন্দোলনের মূল্যায়ন ২৯৩

প্যান ইসলামিজমের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
আবদুল হামিদ দ্বিতীয় এর শাসনকাল ও সাংবিধানিক যুগ
(১২৯৩-১৩২৭ হি./১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)

দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ.....২৯৫
বলকানের চলমান অস্থিরতা ২৯৫
উসমানি ও রুশ যুদ্ধ (১২৯৪ হি./১৮৭৭ খ্রি.).....২৯৬
বার্লিন সম্মেলনের পর দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন ২৯৯
ভূমিকা.....২৯৯
ব্রিটিশদের সাইপ্রাস দখল.....২৯৯
ফ্রান্সের তিউনিসিয়া দখল.....২৯৯
ব্রিটেনের মিশর দখল.....৩০০
বুলগেরিয়ার সঙ্গে পূর্ব রুমেলিয়ার সংযুক্তি.....৩০০
গ্রিস সংকট.....৩০১
আর্মেনিয়া সংকট.....৩০১
দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যে-সকল প্রান্তিক রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হন ৩০৩
দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ও জায়নবাদ ৩০৪
আবদুল হামিদ ও প্যান ইসলামিজম ৩০৬
আবদুল হামিদের সংস্কারনীতি.....৩০৮
বিপ্লব সংঘটন ও ইসলামি খেলাফতের অবসান..... ৩১০
পরিশিষ্ট ৩০৮
ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি.....৩১৩
গ্রন্থপঞ্জি.....৩১৮

অনুবাদকের কথা

মানব সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রামাণ্য ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ। মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা সমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বিশ্বে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলিম জাতির রয়েছে সোনালি অতীত, আছে গৌরবময় ইতিহাস। একসময় মুসলমানরাই ছিল বিশ্বে পরাশক্তির অধিকারী। গোটা পৃথিবীই ছিল তাদের ভয়ে কম্পমান। তাদেরকে চোখ রাঙানি দেওয়ার মতো সাহস কারও ছিল না। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ সর্বত্রই ছিল তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম বাহিনী এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মুসা বিন নুসাইর বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে মরক্কো, তাঞ্জিয়ার-সহ প্রায় সমগ্র আফ্রিকাতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মাত্র ১২ হাজার মুসলিম সৈন্য রডারিকের ১ লাখের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আন্দালুস (স্পেন, পর্তুগাল) জয় করে এবং মুসলমানরা সেখানে প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে। তৎকালীন কর্ডোভার শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা, ও ঐশ্বর্যের দ্যুতি যখন চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন বর্তমান জ্ঞানগর্বিত ও সভ্যতাপ্রদীপ্ত ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মানদের পূর্বপুরুষগণ কুসংস্কার, জঞ্জাল ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মুসলমানরাই ভারত উপমহাদেশ শাসন করে।

চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। প্রায় ৫২ লাখ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সেই সাম্রাজ্যে পৃথিবীর

বর্তমান মানচিত্রে প্রায় ৪২টি দেশের অবস্থান। সেই সময় তাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, বর্তমান সুপার পাওয়ার আমেরিকা ১৭৯৫ সালে উসমানি বাহিনী কর্তৃক আলজেরিয়ার উপকূলে আটককৃত নাবিক ও জাহাজসমূহ ফেরত লাভ এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য উসমানি খেলাফতকে মোটা অঙ্কের এককালীন নগদ ও বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯০১ সালে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কাছে ইহুদিরা লোভনীয় প্রস্তাবের বিনিময়ে ফিলিস্তিনে সামান্য জমি বরাদ্দ চেয়েছিল; কিন্তু সেদিন সুলতান আবদুল হামিদ তাদেরকে যে জবাব দিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেছিলেন, "ফিলিস্তিন গোটা মুসলিমবিশ্বের সম্পদ। এর এক মুষ্টি মাটিও আমি তাদের দেবো না; কারণ, আমি এর মালিক নই। আমি বেঁচে থাকতে কোনো দিন ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের হতে দেবো না।"

বর্তমান প্রজন্মকে মুসলমানদের সেই হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস জানতে হবে। কারণ, ইতিহাস মানুষের আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে। নিজ জাতির সফল সংগ্রাম এবং গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বৈরুতে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম আল-আওযায়ি-এর 'ইসলামের ইতিহাস' বিভাগের অধ্যাপক ড. সুহাইল তাক্কুশের একটি অনবদ্য রচনা। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের শুরুতে জাহেলি যুগের আরব সমাজের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি 'নববি যুগ' শিরোনামের অধীনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন, নবুওয়ত লাভ, মক্কি-জীবন ও মাদানি-জীবনের গুরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংক্ষিপ্ত ভাষায় সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা একজন সিরাত পাঠকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর তিনি খেলাফতে রাশেদার যুগ হতে উসমানি সাম্রাজ্য পর্যন্ত চৌদ্দশ বছরের ইসলামি শাসন ও মুসলিম জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, ইতিহাসের পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্য যা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ড. সুহাইল তাক্কুশের এ বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অল্প কথায় ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল, রাজত্ব ও শাসন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ঘটনাপ্রবাহের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিবরণের চেয়ে বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক মূল্যায়নকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে এ বই পাঠের মাধ্যমে পাঠক ইসলামি ইতিহাস ও মুসলিম শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বিশ্লেষণ সহজে আয়ত্ত করতে পারবে এবং বইটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক চিত্র তার মস্তিষ্কে গেঁথে যাবে। লেখক প্রতিটি তথ্যের সাথে তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আরবি, ইংরেজি, ফারসি-সহ বিভিন্ন ভাষার প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। লেখক বিভিন্ন ঘটনার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে নিজস্ব মতামত প্রদান করে তার প্রাজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু এটি একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসগ্রন্থ, তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ঘটনাবলির বিস্তারিত ও আদ্যোপান্ত জানতে এটির ওপর নির্ভর না করে ইতিহাসের বৃহৎ গ্রন্থাবলির সাহায্য নিতে হবে।

ড. সুহাইল তাক্কুশ রচিত (التاريخ الإسلامي الوجيز) 'মুসলিম জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের সিরাত অংশের অনুবাদ করেছেন উদীয়মান তরুণ আলেম মাওলানা মাহমুদ সিদ্দিকী, যিনি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রচনা ও লেখালেখির মাধ্যমে তার প্রতিভার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তার লেখনীকে উম্মতের জন্য ব্যাপক উপকারী হিসেবে কবুল করুন। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা শতভাগ বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে লেখকের বক্তব্য ও মর্মকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কোথাও বিশেষ কোনো তথ্য বা সংশোধনীর প্রয়োজন হলে টীকার মাধ্যমে তা সংযোজন করে দিয়েছি এবং পাঠক যেন তথ্যসূত্র সহজে খুঁজে বের করতে পারেন তাই মূলগ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে বাংলা নামের পাশাপাশি মূল আরবি ও ফারসি কিতাবের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকাল ইত্যাদি উল্লেখ করেছি, আর ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থের ক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি। পাঠকের অধিক উপকারার্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মানচিত্রসমূহও বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। এরপরও যেহেতু মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই এ বইয়ের মধ্যে যা-কিছু সঠিক ও

উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে তা কেবলই মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ এবং যেসব ভুল পাওয়া যাবে; তার দায়ভার আমার ও শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত হবে। তারপরও মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো ভুলত্রুটি কারও নজরে এলে আমাকে তা অবগত করলে কৃতজ্ঞ হব। বইটির ব্যাপারে সকলের সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ ও আনুষাঙ্গিক সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য চেতনা প্রকাশন ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। আল্লাহ সকলের চেষ্টা ও শ্রমকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং এ বইয়ের লেখক ও পাঠক-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সাআদ হাসান
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৫. ০৪. ২০২২
খ্রি.
m.saadhasan92@gmail.com

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়িদুনা খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং সালাম ও বরকত নাজিল হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির প্রতি। কথা হচ্ছে, কোনো কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধু বিষয়বস্তু বললে হয় না; বরং রচনার ধাপগুলোও বলতে হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পহেলা হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি পর্যন্ত (৬২২-১৯২৪ খ্রি.) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মুসলিম বিজয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে রচিত। মুসলিমবিশ্বের ইতিহাস পাঠ করার পর লক্ষ করেছি, নববি যুগ বাদে প্রত্যেক যুগের ঘটনাবলি ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব-সংক্রান্ত যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ, তা অনেকাংশে সত্য প্রমাণ করেছে। সাম্রাজ্যের জন্মলাভ দিয়ে শুরু, ক্রমবিকাশ পার হয়ে উত্থানের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ, অতঃপর ক্রমান্বয়ে পতন। আসলে সাম্রাজ্যগুলো পরতে পরতে ভাঙনের বীজ ধারণ করে; খুব দ্রুত তা বাড়তে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়; একসময় ভাঙন ঘটে। স্মৃতি হিসেবে রয়ে যায় কেবল কীর্তি। আর তার ইতিহাস হয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষার উপাদান। প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ জাহেলি যুগ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করে এই গ্রন্থে আমি আটটি মুসলিম শাসনযুগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

নববি যুগ ইসলামধর্মের আকিদার মূল ভিত স্থাপন করেছে, নির্ধারণ করে দিয়েছে কর্মপদ্ধতি। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় একক নেতৃত্বের ছায়াতলে জাজিরাতুল আরবের ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সুতরাং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সিরাত হলো সকলের অনুসরণীয় আদর্শ। নবীজির সিরাতে যে-পূর্ণতা পাওয়া যায়, বাবাদের উচিত সন্তানদের তা শিক্ষা দেওয়া। একজন মানুষের সাধ্য

যতটা বিস্তৃত হতে পারে, তার সর্বক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানবিক পূর্ণতার সর্বোত্তম উদাহরণ।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারিত্রিক পূর্ণতা, বুদ্ধির পূর্ণতা এবং আত্মার পূর্ণতা—সব ধরনের উত্তম গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রব; এবং সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজিকে বানিয়েছেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের জীবন্ত নমুনা; যিনি তাঁর ঈমানি শক্তি দিয়ে যুগের সমস্ত ভ্রান্তি নিরসন করে দিতে পারেন। তিনি তাঁর কওমের চিরাচরিত অভ্যাস ও চিন্তাচেতনা বদলে দিতে পেরেছেন। তাদের চারিত্রিক সমস্যাবলি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের উত্তম আদর্শের পথে পরিচালিত করেছেন এবং তাদের মহান ও পবিত্র মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। যারা ঈমানের শক্তি দিয়ে নিজেদের পথ রচনা করতে চায়, তাদের জন্য নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে প্রায়োগিক শিক্ষা রয়েছে।

খেলাফতে রাশেদার যুগকে (১১-৪০ হিজরি/৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) নববি যুগের ব্যাপ্তি হিসেবেই ধরা হয়। কারণ খোলাফায়ে রাশেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। পার্থক্য হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির ধারক ছিলেন। পাশাপাশি ওহির কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পরিবর্তনও আসত।

আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকাল (১১-১৩ হিজরি/৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) বড় ধরনের কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা অগ্রসরমান ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কিছু গোত্রের মধ্যে ইরতিদাদের (ধর্মত্যাগ) ফিতনা দেখা দেয়। মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার প্রকাশ পায়। মুরতাদ ও নবুওয়তের দাবিদারদের নির্মূল করার পর জাজিরাতুল আরবের বাইরে ইসলামের বিজয় শুরু হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. (১৩-২৩ হিজরি/৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামের বিজয়কে পূর্ণতা দান করেন। খেলাফতের পরিধি বিস্তৃত হয়ে শাম, মিসর, ইরাক ও পারস্যের অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্ত করে।

বিজিত অঞ্চলগুলোর মানুষজন ইসলামে প্রবেশ করে। কেউ কেউ ইসলাম অন্তরে বদ্ধমূল করতে পারেনি; বরং ইসলাম ছিল তাদের কাছে কপটতা গোপন করা ও গা-বাঁচানোর উপায় এবং সুযোগের অপেক্ষামাত্র। ফলে উমর রাযি. এই 'জাতীয়তাবাদী চেতনা'র শিকার হয়ে শহিদ হন।

উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর খেলাফতকাল (২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ছিল ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনাকাল। এমনকি তিনি নিজেও এ অস্থিরতার শিকার হয়ে শহিদ হন।

আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.-এর খেলাফতকালে (৩৬-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) ফিতনা বাড়তে থাকে। এ সময় একাধিক ফেরকার জন্ম হয় এবং সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ডালপালা বিস্তৃত হতে থাকে। এর সাথে যুক্ত হয় পারস্পরিক যুদ্ধ ও সংঘাত। আর এইসব কিছুরই শিকার হন আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.।

খেলাফতে রাশেদার পর প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খেলাফত সূচনা থেকে পতন পর্যন্ত আগাগোড়া অধিকাংশ ইতিহাসবিদের কাছে এক প্রহেলিকাঘন চিত্র-স্বরূপ বিরাজমান। তাদের রচনাতে উমাইয়া খেলাফত বিবিধ বীভৎসরূপে অঙ্কিত হয়ে বিভীষিকার অভিধায়ে চিত্রিত হয়ে আছে। এই অন্ধকার আরও বাড়িয়েছে উমাইয়া শাসনামলে সংঘটিত মুসলিমদের অনুভূতি নাড়িয়ে দেওয়া বড় দুর্ঘটনাগুলো। কারবালার দুর্ঘটনা, মক্কা-মদিনায় হামলা। এগুলো উমাইয়াদের সুখ্যাতি ছাপিয়ে নেতিবাচক মনোচিত্র তৈরি করেছে। উসমান রাযি.-এর হত্যা ও সিফফিন যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করা দলের সংখ্যাও বেড়েছে। শিয়া, খারেজি, ক্ষমতালোভী এবং বিদ্বেষীদের সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়াদের শত্রুসংখ্যাও বেড়েছে। অপরদিকে উমাইয়ারা ব্যাবহারিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এমন কিছু কীর্তি রেখে গেছে, যা তাদের সম্পর্কে নিছক ক্ষমতালিপ্সার অভিযোগ নাকচ করে দেয়। তাওহিদ ও জিহাদের পতাকা সমুন্নত করার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তারা যে-বিজয় নিয়ে এসেছে, যে-মর্যাদাসৌধ তারা নির্মাণ করেছে, ইসলামের

মৌলিক চেতনা থেকে তা আলাদা করা সম্ভব নয়; যা নববি যুগ থেকে মুসলিমদের প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে।

আব্বাসি ইতিহাসের ঘটনাগুলো জটিল ও দুর্বোধ্য। নানারকম রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আব্বাসি যুগকে উমাইয়া যুগের সম্পূরক কাল ধরা হয়। তবে আব্বাসি খেলাফতে আরবি, পারসিক ও তুর্কি—বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। উমাইয়াদের থেকে আব্বাসিদের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া একটি গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। যা ইসলামি শাসনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকের জন্ম দিয়েছে। এটি মুসলিম-সমাজের মৌলিক চিত্র পালটে দিয়েছে; জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফেলেছে সুস্পষ্ট ছাপ। এই ঘটনা অনারব মুসলিমদের সামনে রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ এবং ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বরং বলা যায়, নেতৃত্বের কেন্দ্রে আসার পথ সুগম করে দিয়েছে।

আব্বাসি শাসনের প্রথম ধাপের (১৩২-২৩২ হিজরি/৭৫০-৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) দুর্ঘটনাগুলো খলিফাদের ভালো কাজের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু শেষ ধাপের (২৩২-৬৫৬ হিজরি/৮৪৭-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনাগুলো ঘটেছে খেলাফতে আব্বাসির ছায়ায় গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অধীনে। যারা খেলাফতের রাজনৈতিক শক্তির পতনের কালে মুসলিমবিশ্বকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

আন্দালুসের ইতিহাসের (৯৫-৮৯৭ হিজরি, ৭১৩-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনাগুলোকে ধরা হয় মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। উন্নতি, উৎকর্ষ, অধঃগতি ও পতন-সহ সবটুকুকে। এ কথা স্পষ্ট যে, আন্দালুস-বিজয় ছিল মরক্কো বিজয়ের স্বাভাবিক বিস্তার। পরবর্তী সময়ে একটি অপরটির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ উভয়কে ঐক্যের ছায়াতলে নিয়ে আসে। আন্দালুস তার স্বর্ণযুগ কাটিয়েছে প্রথমে উমাইয়া প্রশাসনের অধীনে এবং পরে উমাইয়া খেলাফতের আমলে। এরপর আন্দালুসের শহরগুলো পতনের সাক্ষী হয়েছে। আন্দালুসের সমাজ বিবদমান বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যা স্পেনিশদের রাষ্ট্র

পুনরুদ্ধার তৎপরতায় প্রচণ্ড রকম উৎসাহিত করেছে। এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গ্রন্থের আলোচনা এগিয়েছে।

তারপর মাগরিবে প্রতিষ্ঠিত আদ-দাওলাতুল উবাইদিয়ার (ফাতেমিয়া) (২৯৭-৫৬৭ হিজরি/৯১০-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ) ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে চলে গেছি মিসরে—মাযহাবের ইখতিলাফের কারণে প্রাচ্যে চলমান আব্বাসি খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য। প্রতিষ্ঠা থেকে নিয়ে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে পতন পর্যন্ত উবাইদি সাম্রাজ্য যতগুলো ধাপ অতিক্রম করেছে, তার সবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

মোঙ্গলদের হামলায় (৬৫৬ হিজরি/১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসি খেলাফতের পতন ঘটে। এরপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ছায়ায় বেড়ে ওঠা তুর্কি মামলুকরা আড়াই শতাব্দী (৬৪৮-৯২৩ হিজরি/১২৫০-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অবস্থান করে। ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষায় তারা প্রচুর কুরবানি দিয়েছে। তারা মুসলিমবিশ্বে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছে। মুসলিম প্রাচ্য থেকে অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা সত্ত্বেও কায়রোতে আব্বাসি খেলাফতের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে।

তারপর উসমানিদের (৬৯৮-১৩৪২ হিজরি/১২৯৯-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) হাতে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে মামলুকদের পতন ঘটে। উসমানিরা ইসলামের অর্জনগুলো উত্তরাধিকাররূপে লাভ করে। তারা তা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আরও কিছু অঞ্চল নিজেদের শাসন অন্তর্ভুক্ত করেছিল—যারা সামগ্রিক মুসলিম ঐক্য বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিংবা ইউরোপীয়দের জন্য যারা হুমকিস্বরূপ ছিল। তারা ইউরোপীয় শক্তির মোকাবেলায় পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। উসমানিরা মুসলিমবিশ্বের পরিধি এমন সব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল, যেখানে ইতঃপূর্বে কখনো ইসলামের প্রবেশ ঘটেনি।

কিন্তু এই উসমানি সাম্রাজ্যও পর্যায়ক্রমে পতনের সম্মুখীন হয়। সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির মৃত্যুর (৯৭৪ হিজরি মোতাবেক ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) সঙ্গে সঙ্গে কার্যত পতন শুরু হয়ে যায়। একদিকে

উসমানি সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় শিথিলতা দেখা দেয়, অপরদিকে জাগতিক উন্নয়নের বাহনে ভর করে ইউরোপীয়রা পুনর্জাগরণ ও নতুন যুগের সূচনা করে। তিন মহাদেশেই উসমানি সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলো আস্তে আস্তে হাতছাড়া হতে শুরু করে। ১২৯৫ হিজরি মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বার্লিন কনফারেন্সের মাধ্যমে উসমানি সাম্রাজ্যের দৃশ্যমান পতনের সূচনা হয়। চূড়ান্ত পতন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। একদিক দিয়ে প্রবেশ করে ইউরোপীয় ও জায়নবাদীরা, অপরদিকে উসমানি সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক লিপ্সা; যারা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে বরখাস্ত করে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল। উসমানি খেলাফতের ভগ্নাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহ্য বিস্মৃত আধুনিক তুরস্ক।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আরবি ভাষাভাষীদের পাঠাগারগুলো একজন বিশেষজ্ঞের গবেষণালব্ধ একটি গ্রন্থের অপেক্ষায় আছে; যাতে মুসলিম শাসনামলসমূহের ইতিহাস সামগ্রিক মূল্যায়নে উপস্থাপিত হবে। একজন আরব ও মুসলিম পাঠকের সামনে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমি এই সর্বজনগ্রাহ্য সত্যিকার মূল্যায়ন-শৈলীর ওপরই নির্ভর করেছি। যাতে একজন পাঠক সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস জানতে পারে। পাশাপাশি আমি বাহুল্য বিবরণ পরিহার করেছি; ইতিহাসের রহস্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জানতে আগ্রহ পোষণ করেন এমন অনুসন্ধানী পাঠক, যেগুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

আমার আস্থা, পাঠক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে আনন্দ ও উপকারিতা—একসঙ্গে উপার্জন ও উপভোগ করবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনার সমাধানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার মুখোমুখি হতে পারবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং আরব ও মুসলিম পাঠকদের এর দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করার একমাত্র মালিক।

ড. মুহাম্মাদ সুহাইল তাক্কুশ
০১. ০৪. ২০০১, বৈরুত

প্রথম অধ্যায়

জাহেলি যুগ[১]

[১] ঐতিহাসিকগণ ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাসকে 'জাহেলিয়াতের ইতিহাস' বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। জাহেলিয়াত পরিভাষাটি ইসলাম আগমনের পর সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম-পরবর্তী অবস্থা থেকে আলাদা বোঝাতে ইসলাম-পূর্ববর্তী অবস্থাকে জাহেলিয়াত বলা হয়।–*আল মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম* : আলি জাওয়াদ, খ. ১, পৃ. ৩৭।

পূর্বকথন

মুসলিম শাসনের ইতিহাস অধ্যয়নের আগে আমাদের ইসলাম-পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস জানতে হবে। বিশেষ করে আরব জাতিগুলোর ইতিহাস এবং পার্শ্ববর্তী পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা বুঝতে হবে।

ইসলামি আকিদার ঐক্যের ছায়াতলে আসার পূর্বের জাহেলি যুগ হলো এই জাতিগুলোর ইতিহাসের প্রথম উৎস। চলুন জেনে নিই, পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী জাতিগুলো তাদের থেকে কতটুকু সাহায্য পেয়েছিল। মুসলিম বিজেতারা এদের মুখোমুখি হয়েছিল অনেকটা ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়ে। এই সাম্রাজ্যগুলোর অনেকে মুসলিম বিজেতাদের হাত ধরে পরবর্তীকালে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

আমরা এখন জাহেলি যুগে প্রবেশ করছি। শুরুর ধাপে আছি। জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দারা যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে, প্রথমে আমরা এর মৌল বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব। কারণ, সেই মৌল বিষয়গুলোই ইতিহাসে তাদের উৎকর্ষের পথে প্রধান চালিকাশক্তিরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাসের মোট দুটি ধাপ রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটির পরিসীমা হলো খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই দুই শতাব্দীর আগ পর্যন্ত। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে মোটামুটি একমত।
আরবদের জীবনব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার মৌলিক বিষয়গুলো ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; যেখানে তারা জন্মলাভ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে। এজন্য প্রথমেই আমরা জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

ভৌগোলিক পরিবেশ

জাজিরাতুল আরবের (আরব উপদ্বীপপুঞ্জ) ভৌগোলিক পরিবেশ জাহেলি যুগের ইতিহাসে উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। জাজিরার বাসিন্দাদের ওপর তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ বিশেষ প্রভাব রেখেছে।

মানুষ পরিবেশের সন্তান। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার পরিবেশে যদি স্পষ্ট ভিন্নতা থাকে, তা হলে এর আবশ্যিক ফলাফল হলো—অঞ্চলভেদে তাদের সভ্যতা ও অগ্রসরমানতার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকবে। আমরা পরবর্তী ধাপগুলোতে জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করব। স্বাভাবিকভাবে ভৌগোলিক পরিবেশের আলোচনা তিনটি ভাগে বিভক্ত : **১.** ভৌগোলিক অবস্থান, **২.** গঠন ও অবকাঠামোগত অবস্থা এবং **৩.** অভ্যাস ও আচরণগত অবস্থা।

ভৌগোলিক অবস্থান

জাজিরাতুল আরব হলো, এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। এর পরিধি ৩০ লাখ বর্গকিলোমিটার। ভূখণ্ডটি তিন দিক থেকে জলবেষ্টিত। পূর্ব সীমান্তে আরব উপসাগর, দক্ষিণ দিকে ভারত উপ-মহাসাগর এবং পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর। উত্তর দিকে এর পরিধি আকাবা উপসাগর (Gulf of Aqaba) থেকে নিয়ে আরব উপকূলের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই পরিধি যে-সীমান্ত তৈরি করেছে—একে বলা হয় 'আল-হিলালুল খাসিব' বা চন্দ্রাকার ভূমি (Fertile Crescent)।[২]

আরব্য পণ্ডিতগণ রূপকার্থে তাদের ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলে ডাকেন।[৩]

গঠন ও অবকাঠামোগত অবস্থা

গঠন ও অবকাঠামোগতভাবে জাজিরাতুল আরবের অধিকাংশ ভূখণ্ড মরুভূমি ও সমভূমির সমন্বয়ে গঠিত। তাদের আচার-আচরণ ও স্বভাব-প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও সেখানে মরু-স্বভাবের প্রভাবই বেশি। কারণ, জাজিরার কিছু ভূমি বালুর ঢিবি, আবার কিছু ভূমি পাহাড়, টিলা ও অগভীর গর্ত। উঁচু মালভূমি তো আছেই। আরবের গঠন ও অবকাঠামোগত ভূগোল অধ্যয়ন করে আমরা দেখতে পাই—জাজিরাতুল আরব বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :

---

২. *কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক*, আল-ইস্তাখরি, আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফারিসি, পৃ. ২১; *সিফাতু জাজিরাতিল আরব*, হামাদানি, আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আহমাদ, পৃ. ১

৩. *মুজামুল বুলদান*, ইয়াকুত আল-হামাবি, খ. ২, পৃ. ১৩৭।

আন-নুফুদ : বিস্তীর্ণ বালু-মরুভূমি, যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে গ্রানাইট পাথরের চূর্ণ। নুফুদ জাজিরাতুল আরবের উত্তর দিকে নজদ ও শামের মরু অঞ্চল এবং নজদ ও আহসার মাঝামাঝি অবস্থিত।[৪]

আল-হিরার : হাররা হলো লাভাময় কালো পাথুরে পাহাড়। আল হিরার বা লাভাময় কালো পাথুরে পাহাড় জাজিরাতুল আরবের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। অবশ্য কোনো কোনো মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং নজদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেও লাভাময় কালো পাথুরে পাহাড় রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে 'আর রাবউল খালি' বা শূন্য মরুভূমিতে (Empty Quarter) তো পাওয়া যায়-ই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'হাররাতু তাবুক' এবং খাইবারের নিকটে অবস্থিত 'হাররাতু নার'।[৫]

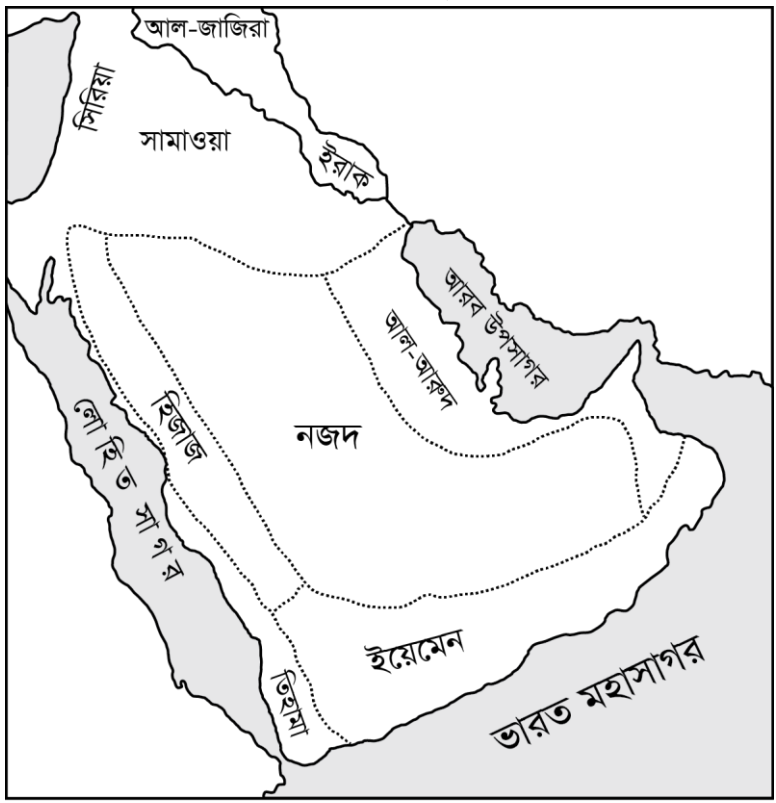

আরব উপদ্বীপ

৪. *আল মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, আলি জাওয়াদ, খ. ১, পৃ. ১৫২-১৫৩।
৫. *মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

আদ-দাহনা : আদ দাহনা হলো লাল বালুময় বিস্তীর্ণ ভূমি। উত্তরে নুফুদ থেকে নিয়ে হাদরামাউত পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মাহরা পর্যন্ত, পশ্চিমে ইয়েমেন এবং পূর্বে ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত। আদ দাহনার দক্ষিণ ভাগকে 'আর রাবউল খালি' বা শূন্য মরুভূমি (Empty Quarter) বলা হয়। পশ্চিম ভাগকে বলা হয় 'আহকাফ'।[৬]

আদ-দারাত : আদ দারাত হলো সমভূমি। টিলাবেষ্টিত কিছুটা গোলাকার অঞ্চল। এই এলাকায় কিছুটা ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যায়। যার ফলে সেখানে ঘাস ও মরু-উদ্ভিদ জন্মায়।[৭]

আস-সুহুল : আস সুহুল হলো সমতল ভূমি। একটা ক্ষীণ রেখা হয়ে জাজিরাতুল আরবকে ঘিরে রেখেছে কিছু সমতল ভূমি। প্রসিদ্ধ সমভূমিগুলো হলো—তিহামা, হাদরামাউত এবং ওমানের উপকূলীয় ভূমিগুলো।

পর্বতশ্রেণি : সাধারণত উপকূলীয় সমভূমির পরেই থাকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। প্রসিদ্ধ পর্বতমালা হলো, লোহিত সাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা মুতিল্লাহ (Metula) পর্বতমালা এবং দক্ষিণ পর্বতমালা।

টিলা : টিলাগুলোর অবস্থান পর্বতমালার পেছনে। এর মধ্যে বিখ্যাত টিলা হলো, 'হাজবাতুন নজদ' বা নজদের টিলা।

নদী ও উপত্যকা : জাজিরাতুল আরবে বড় বড় নদী বা সমুদ্র পাওয়া যায় না। এজন্য আরবাঞ্চলের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, তা আগুনের মতো গরম ও রুক্ষ অঞ্চল। তবে আরবে প্রচুর পরিমাণে উপত্যকা রয়েছে।

বৃষ্টি : তিন দিক থেকে পানিবেষ্টিত হলেও জাজিরাতুল আরবে বৃষ্টি খুব কম হয়। দুদিক থেকে লোহিত সাগর ও আরব উপসাগর ঘিরে রাখলেও কোনো কাজে আসে না। কারণ, একদিকে সাগর-দুটি সংকুচিত, অপরদিকে জমির স্তর অতি শুষ্ক। ভারত উপমহাসাগরের আর্দ্রতা উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। আর মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টি হয় আরব-উপসাগরের আকাশে বাষ্পীভূত হওয়া মেঘমালা থেকে। বৃষ্টি বেশি হয় শাম্মার পর্বতমালায়।

---

৬. The Empty Quarter (in the Geographical Journal) : H. Philpy. 81. PP1-261.

১৩. *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

হিজাজে মাঝেমধ্যে খরা মৌসুম চলে। এই অবস্থা কখনো টানা তিন বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়ত থাকে। আবার মাঝেমধ্যে শীতকালে মক্কা-মদিনায় প্রবল বর্ষণ হয়। বর্ষণ থেকে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল নেমে আসে উপত্যকা ও গিরিপথে। অনেক সময় কাবা পর্যন্ত সয়লাব হয়ে পড়ে সেই ঢলের রেশ।

বৃষ্টিবর্ষণের এই অনির্দিষ্টতার ফলে জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের জীবনযাপনে পার্থক্য দেখা দেয়। উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি অনিয়মিত হয় বলে স্থায়ী কোনো কৃষিপ্রধান জীবন গড়ে ওঠেনি। সেখানে চারণভূমিতে যে-ঘাস জন্মায়, তাতে পশু-চরিয়ে যাযাবর লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে, সেখানকার জীবন পশুচারণ ও যাযাবরপ্রধান হয়ে ওঠে। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলে নিয়মিত বৃষ্টি হওয়ার কারণে কৃষিপ্রধান স্থায়ী সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আবহাওয়া : জাজিরাতুল আরবের আবহাওয়া সাধারণত প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মকালে পাথুরে অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে লুহাওয়া প্রবাহিত হয়। সবচেয়ে কোমল বাতাস হলো পুবালি বাতাস। আরবরা একে 'সাবা' বলে। উত্তুরে বাতাস সাধারণত শীতল হয়। বেশি শীতল হয় পুবালি বাতাস। কারণ, প্রায় সময় তা তুষারে পরিণত হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জাজিরাতুল আরবের প্রাকৃতিক পরিবেশ কত ভাগে বিভক্ত—ভূগোলবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে এই শ্রেণিবিন্যাসে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। গ্রিক ও রোমক ভূগোলবিদগণ আরবের প্রাকৃতিক পরিবেশকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের প্রথম যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি তারা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন উঁচু-নিচু ভূ-ভাগকে। তাদের করা ভাগটি নিম্নরূপ—

১. সুখীসমৃদ্ধ আরব। হিজাজ, ইয়েমেন এবং নজদ—এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

২. পাথুরে আরব। সিনাই উপদ্বীপ (Sinai Peninsula) ও নাবাতিয়্যাহ সাম্রাজ্য (Nabataean Kingdom) এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. মরু আরব। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, 'বাদিয়া আশ-শাম' (Syrian Desert) বা সিরীয় মরুভূমি।

তবে আরব ভূগোলবিদরা এই শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিছক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করেননি। বরং এ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামপূর্ব যুগের আরব অধিবাসীদের জীবনযাত্রার চিত্রগুলোও সামনে রেখেছেন। তারপর পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন।[৮]

ভাগটি নিম্নরূপ—

তিহামা : তিহামা হলো লোহিত সাগরের কোলঘেঁষা উপকূলীয় সংকীর্ণ অঞ্চল। যার পরিধি ইয়াম্বু থেকে ইয়েমেনের নাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে একে বলা হয়—ইয়েমেনের তিহামা।

হিজাজ : হিজাজ হলো তিহামার পূর্ব দিকে অবস্থিত উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের সারি, যা তৈরি করেছে সারাত পর্বতমালা (Sarawat Mauntains)। হিজাজ নজদের টিলা ও তিহামার মাঝে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিজাজের অঞ্চল সিরিয়া-সীমান্তের গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাহাড়ি উপত্যকা, আগ্নেয়গিরি এবং পাথুরে ভূমির অবস্থান। যখন কূপ ও ঝরনার পানি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে শুরু করে, তখন ইয়াসরিব ও ওয়াদিল কুরার মতো বড় বড় জনপদগুলো গড়ে ওঠে।

নজদ : পূর্ব দিকে হিজাজ নজদের বিস্তৃত টিলা পর্যন্ত প্রসারিত, যেটিকে জাজিরাতুল আরবের হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঢালু হয়ে নেমে মিশে গেছে আরুজের সাথে। নজদের উত্তর দিকে অবস্থিত নুফুদ মরুভূমি। যা তাইমার (Tayma) মরূদ্যান থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে প্রায় ৩০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু উঁচু বালির ঢিবি দিয়ে ভরতি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বিস্তৃত পশুচারণভূমি।

আরুজ : আরুজের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো হলো—ইয়ামামা, বাহরাইন এবং এর আশেপাশের অঞ্চল। ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাভি অবশ্য ইয়ামামাকে নজদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন।

ইয়েমেন : জাজিরাতুল আরবের পুরো দক্ষিণাঞ্চলকে ইয়েমেন বলা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো হলো—হাদরামাউত, মাহরা (Mehri) এবং

---

৮. *মুজামুল বুলদান*, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮; *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ১৬৩-১৮১।

আশ-শিহর। জাজিরার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে বলা হয় আশ-শিহর। বর্তমানেও এটি এ নামে প্রসিদ্ধ।

ইয়েমেন হলো তিন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত। **এক.** সংকীর্ণ কিন্তু উর্বর উপকূলীয় অঞ্চল, যা ইয়েমেনের তিহামা নামে পরিচিত। **দুই.** উপকূলের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালা, যা বিস্তীর্ণ সারাত পর্বতমালার (Sarawat Mountains) অংশ। **তিন.** তার পর সেখানে আছে নজদ ও শূন্য মরুভূমি (Empty Quarter) পর্যন্ত বিস্তৃত টিলা। এই তিন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চল হলো ইয়েমেন। ইয়েমেনে প্রচুর পাহাড়ি উপত্যকা এবং ফসলি সমতল ভূমি আছে।

আরব জাতিসমূহ

আরব জাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ ইসলামপূর্ব আরবকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন :

বিলুপ্ত আরব [العرب البائدة] : এরা হলো ওই সকল প্রাচীন আরব গোত্র, যারা ইসলাম আসার পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ গোত্র হলো—আদ, সামুদ, তাসাম, জুদাইস এবং আমালিকা সম্প্রদায়।

শুদ্ধভাষী খাঁটি আদি আরব [العرب العاربة] : খাঁটি বা আদি আরব হলো কাহতান গোত্রের শাখাগুলো। তাদের আদি নিবাস ইয়েমেনে। কাহতানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুটি শাখাগোত্র হলো, জুরহুম ও ইয়ারুব।

রূপান্তরিত বা পরিশোধিত আরব [العرب المستعربة] : রূপান্তরিত আরব হলো আদনানি বংশধর, যারা আদনান বিন ইসমাইল বিন ইবরাহিম খলিলের বংশধর। তাদের মধ্যে প্রথম ইসমাইল আলাইহিস সালাম জাজিরাতুল আরবে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মক্কায় আবাস গড়ে তোলেন। তাদের রূপান্তরিত আরব বলার কারণ হলো, ইসমাইল আলাইহিস সালাম মূলত ইবরানি অথবা সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। তারপর জুরহুম গোত্রের সদস্যরা যখন মক্কায় ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং তাঁর মায়ের সাথে বসবাস শুরু করেন, তখন ইসমাইল তাঁদের এক কন্যাকে বিয়ে করেন ও আরবি ভাষা শিখে নেন। শহুরে ও বেদুইন—আরবের অধিকাংশ জনগণই রূপান্তরিত বা ওই পরিশোধিত আরব।

ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরবের জনগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যার ফলে মরু অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রধানত ভ্রাম্যমাণ পশুচারণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করেছে। একই সময়ে উর্বর অঞ্চলের বাসিন্দারা নির্ভর করেছে চাষাবাদের ওপর। অবশ্য তারা ব্যবসাপাতিও একেবারে ছেড়ে দেয়নি। পাশাপাশি শিল্পজ্ঞানও ছিল এদের, যার দরুন এরা ছিল মরুবাসিন্দাদের তুলনায় ভাগ্যবান।

জাজিরাতুল আরবের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে পানির উৎসের ভিন্নতার একটি স্বচ্ছ চিত্র সামনে আসে। যার কারণ মূলত দুটি বিষয়।

এক. ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার ভিন্নতা

এর প্রভাব পড়েছে বেশ কিছু অঞ্চলে; মরু অঞ্চলগুলোতে, যেখানে ভ্রাম্যমাণ পশু চরানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। কিছু অঞ্চল আছে, প্রাকৃতিকভাবে অতটা রুক্ষ নয়, সেখানে ঘাস জন্মায় প্রচুর এবং তুলনামূলকভাবে থাকেও দীর্ঘদিন। এ কারণে মরুবাসী রাখালেরা যেসব অঞ্চলে বেশি চারণভূমি পাওয়া যায়, সেসব অঞ্চলে অনেকটা স্থায়ীভাবে বসবাস করত। যেমন : 'চন্দ্রাকার ভূমি'র (Fertile Crescent) পাশে অবস্থিত অঞ্চলগুলো।

আবার কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মরূদ্যান আছে, যেখানে কিছু ঝরনার দেখা মিলে। এর মাধ্যমে সীমিত পরিসরে চাষাবাদ করা যায়। যেমনটা নজদ ও হিজাজের কিছু মরূদ্যানে দেখা যায়।

আরও কিছু অঞ্চল আছে, যেখানে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌসুমি বর্ষণের ফলে উর্বর মাটির উপস্থিতি পাওয়া যায়। যেমনটা জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ ভাগে দেখা যায়।

দুই. জাজিরাতুল আরবের ভূ-সামুদ্রিক অবস্থান একদিক থেকে নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের অঞ্চল এবং অপরদিকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা অঞ্চলগুলোর মাঝামাঝিতে। এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে অবস্থিত জাজিরা হলো ভূ-সামুদ্রিক ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর ট্রানজিট রোড।

এখানে প্রাকৃতিক ও জনগণের অবস্থা থেকে বর্ণনা করা শুরু করা যাক এবার। জাহেলিয়াতের শেষদিকে আমরা জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথম শ্রেণিটির স্থায়ী কোনো আবাসন ব্যবস্থা নেই। তারা বারবার নিজেদের আবাসন পরিবর্তন করে এবং পশু চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। দ্বিতীয় শ্রেণিটি হচ্ছে, যাদের স্থায়ী আবাসস্থল আছে। তারা কৃষিকাজ করে। তৃতীয় শ্রেণিটির অবস্থা এর মাঝামাঝি। তারা কখনো আবাসন পরিবর্তন করে, কখনো-বা স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে।

এই শ্রেণি বিভাগের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতির কিছু চিত্র সামনে আসে। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

পশুচারণ : পশুচারণ মানে হলো, স্থির বা চলমান অবস্থায় পশুকে বেঁধে রাখা। জাজিরাতুল আরবের মরুবাসীদের বিরাট একটি অংশের প্রধান অর্থনৈতিক উৎস হলো এই পশুচারণ। মরু অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থাই এমন। প্রধানত তারা উট চরাত। কারণ, উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য যেকোনো পশুর তুলনায় মরুভূমির ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বেশি উপযোগী। আর যেসব অঞ্চলে ঘাস জন্মায় ভালো, সেগুলোতে বেশি চরানো হতো ছাগল; কখনো কখনো ঘোড়া ও অন্য কোনো গবাদি পশু। পশু চরানোর জমিগুলো সাধারণত গোত্রের যৌথ মালিকানাধীন হতো। তবে এর মানে এই নয় যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন চারণভূমি ছিল না। তবে এর স্থায়িত্ব নির্ভর করত পানি ও ঘাসের পর্যাপ্ততার ওপর।

লড়াই : মরু-রাখালেরা অর্থনৈতিকভাবে আরেকটি উৎসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেটি হলো, মরূদ্যানগুলোর বাগানের উৎপাদিত খেজুর। কিন্তু সেটা পেতে হতো লড়াই করে।

কাফেলা অতিক্রমের মুনাফা : মরুবাসীরা তাদের এলাকা দিয়ে ব্যাবসায়িক কাফেলা অতিক্রম থেকে মুনাফা অর্জন করত। গোত্রের লোকেরা তাদের

এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ পথে কাফেলাকে পথ দেখাত এবং বিভিন্ন সেবা দিত। এর বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক পেত।

মধ্যস্থতা : রাখালেরা শহর এবং মরু এলাকার মাঝে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করত। বিশেষ করে বিস্তৃত উর্বর সমভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে। যেমন : রাফিদিন উপত্যকায় (Mesopotamia) এবং সিরীয় এলাকায়। এর থেকেও তারা কিছুটা পারিশ্রমিক পেত। তবে এসব মরু-রাখালদের জন্য সীমান্তবর্তী শহরগুলোর সঙ্গে কোনো প্রকার ব্যাবসায়িক লেনদেনের অনুমতি ছিল না।

কৃষি ও চাষাবাদ : আরবের অর্থনীতির আরেকটি প্রধান উৎস হলো কৃষি ও চাষাবাদ। কৃষি মূলত ছিল ইয়েমেন এবং যেসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যেত, সেসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক নির্ভরতা। বিভিন্ন প্রকারের ফসল চাষাবাদ হতো। ফল-ফলাদি, গম, সবজি ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশেষভাবে তিন প্রকারের চাষ প্রসিদ্ধ। খেজুর, আঙুর ও গম। এ ছাড়া প্রাকৃতিক মসলা ও সুগন্ধি তো আছেই। দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং হিজাজ ও ইয়ামামার গ্রামগুলোতে প্রচুর চাষাবাদ এবং ফল-ফলাদি হতো। ইয়েমেন প্রসিদ্ধ ছিল লোবান, সুগন্ধি ও বাখুর গাছের কারণে। তায়েফ প্রসিদ্ধ ছিল আঙুর ফলের কারণে। আর খেজুর তো পুরো জাজিরাতুল আরবের প্রধান ফল।

ব্যবসা : আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসায় একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। কারণ, ব্যবসায় তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আরবদের ব্যবসা ছিল কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

সুগন্ধি ও মসলা উৎপন্ন হতো জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চলে। এগুলো বাইরে রপ্তানিও করা হতো।

জাজিরাতুল আরবের অবস্থান হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে। যেখান দিয়ে বাণিজ্যিক স্থলপথ গেছে। উপকূল দিয়ে গেছে লোহিত সাগর পার হয়ে সামুদ্রিক পথ। এটি সামগ্রিকভাবে জাজিরাতুল আরবকে এবং বিশেষভাবে হিজাজকে বানিয়েছে সেতুপথ, যা শামের অঞ্চলগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি করেছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের অঞ্চলগুলোকে ইয়েমেন, হাবশা, সোমালিয়া ও ভারত মহাসাগরের উপকূল ঘেঁষা

অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই বাণিজ্যপথে অবস্থিত অঞ্চলগুলো বৈষয়িকভাবে বেশ লাভবান হয়েছে। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মক্কা এবং ইয়েমেনের কিছু শহরের মতো বড় বড় জনপদ। এই অঞ্চলগুলো বানিয়ে নিয়েছে সর্বজনীন পথ; চলাচলের জন্য ব্যবসায়ী ও মুসাফির, সকলেই যা ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে আরবের অঞ্চলগুলো বৈশ্বিক বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথগুলোর মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে; যা প্রাচ্যকে মিলিত করেছে পাশ্চাত্যের সাথে।

এই বাণিজ্য ও শিল্প কার্যক্রমকে উপলক্ষ্য করে কয়েকটি মৌসুমি মেলার আয়োজন হতো। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ মেলাগুলো হলো—ওকাজ, জুল মাজান্না ও জুল মাজায। এ ছাড়াও অনাবাদি অঞ্চলে আরও কিছু স্থায়ী বাজার ছিল।

সামাজিক অবস্থা

আরবের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মরু-বেদুইন ও শহুরে মানুষের সমন্বয়ে। বেদুইনরা হলো মরুভূমির বাসিন্দা। উটের দুধ ও গোশত খেয়ে তারা জীবনধারণ করে। পানি ও ঘাসের উৎস যেখানে, সেখানে তারা বসবাস করে। আর শহুরে মানুষ বলতে উদ্দেশ্য হলো, নগর ও গ্রামের বাসিন্দা—যারা চাষাবাদ, চাকরি, ব্যবসা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি কাজ করে জীবনধারণ করে। এরা স্থায়ী ঘরবাড়ির সাথে পরিচিত। মরুজীবন ও শহুরে জীবন নির্ণয় করার উপায় হলো, জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য ও ধরন দেখা।[৯]

যেহেতু রুক্ষতাজনিত বৈশিষ্ট্য জাজিরাতুল আরবে প্রতুল, তাই স্থায়ী বসবাসকারীর চেয়ে মরুবাসীর সংখ্যাই বেশি। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়মনীতির ক্ষেত্রেও মরুজীবন প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। শহুরে ও মরুচারী—উভয় সমাজ দুটি বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে মিল রাখে। এটিই তাদের ঐক্যের কারণ, এটিই আবার শ্রেণিগত বিভক্তির কারণও।[১০]

আরবসমাজ নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল, যা তাদের সদস্যদের একটি গোত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহযোগিতা

---

৯. *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৪, পৃ. ২৭০।

১০. *আল-আরব ফিল উসুরিল কাদিমাহ*, লুতফি আবদুল ওয়াহহাব, পৃ. ৩৭১।

করেছে। গৌত্রিক সম্পর্কের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা এবং একধরনের ঐক্যের চিন্তা গোত্রগুলোর মাঝে জাগিয়ে তুলেছে। বিষয়গুলো হলো—

গোত্রপ্রীতি ও প্রতিশোধপ্রবণতা : প্রাচীন আরবের যেসব গোত্রকেন্দ্রিক যুদ্ধের কথা প্রচলিত আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুটি প্রবণতা দায়ী। সেকালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হলো—বাসুস যুদ্ধ,[১১] দাহিস ও গুবারা যুদ্ধ,[১২] হারবুল ফিজার বা ফিজার যুদ্ধ।[১৩] অপরদিকে স্বজনপ্রীতি তৈরি হতো বংশ অথবা রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে, যাতে করে জোটবদ্ধতার অন্য কারণগুলো পাওয়া না গেলে এটা হতে পারে জোটবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্ন সদস্যদের একতাবদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম।

তো, গোত্র হলো মরুভূমিতে জীবনধারণের প্রধান স্তম্ভ। নিজের জানমাল রক্ষার জন্য বেদুইনরা গোত্রের আশ্রয় নিত। একইভাবে গোত্রের জন্য সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিত। মরুচারী বেদুইনরা গোত্রকেন্দ্রিক সমাজের বাইরে রাষ্ট্র বলতে কিছু বুঝত না। গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে বেদুইনদের মিত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, যুদ্ধ প্রতিহত করা, জানমাল রক্ষা করা এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের অবাধ্যতায় লাগাম পরানোর ক্ষেত্রে সব গোত্রের শক্তি সমান নয়। যার ফলে প্রতিরক্ষামূলক মিত্রশক্তি গঠিত হতো। একইভাবে আক্রমণের জন্যও মিত্রশক্তি গঠিত হতো। অপরদিকে নগর বাসিন্দারা নিজ নিজ ভূমিতে বসবাস করত। তাদের জীবনব্যবস্থার প্রকৃতিই ছিল এমন, যাতে মিত্র গোত্রের প্রয়োজন খুব একটা হতো না।

যৌথ জীবনব্যবস্থা : অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই আরব সমাজের মরু-জীবনব্যবস্থায় পানি ও ঘাসের ক্ষেত্রে যৌথ অংশগ্রহণ আবশ্যিক ছিল।

---

১১. **বাসুস যুদ্ধ :** এই যুদ্ধটি লেগেছিল বকর ও তাগলাব গোত্রের মধ্যে। ৪০ বছর এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এর কারণ ছিল—বকর গোত্রের বাসুস নামের এক নারীর একটি উটকে হত্যা করা হয়েছিল।

১২. **দাহিস ও গুবারা যুদ্ধ :** দাহিস ও গুবারা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আবস ও জুবইয়ান গোত্রের মধ্যে। স্থায়ী হয়েছিল ৪০ বছর। এই যুদ্ধের কারণ ছিল—দাহিস ও গুবারার মধ্যকার প্রসিদ্ধ রেস। দাহিস হলো কায়েস বিন জুহাইর নামক এক ব্যক্তির ঘোড়া, গুবারা হলো হুজাইফা বিন বদর নামক এক ব্যক্তির ঘোড়া।

১৩. **হারবুল ফিজার বা ফিজার যুদ্ধ :** এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল নিষিদ্ধ মাসে। এ কারণে এই যুদ্ধকে ফিজার বা পাপাচার বলা হয়। কয়েকটি আরব গোত্রের মধ্যে লেগেছিল এই যুদ্ধ। কুরাইশও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। হারবুল ফিজার মোট চারবার হয়েছিল। সর্বশেষটি হলো প্রসিদ্ধ হারবুল ফিজার।

গোত্রের জন্য এটি ছিল মূল্যবান প্রাণশক্তি। এই যৌথতা গোত্রের সদস্যদের একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ ও যূথবদ্ধ থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করত। আরবসমাজ অর্থনৈতিক জীবনের এমন কিছু দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল, যা তাদের পারস্পরিক ঐক্য বজায় রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এর একটি ছিল—ন্যূনতম একটি পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে কোনো বিষয়ের যৌথ মালিকানা থাকা।

এ ছাড়া জাহেলিয়াতের শেষদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যা তাদের সামাজিক পরিবেশকে একতাবদ্ধ করার কথা ভাবতে সহায়তা করেছিল। এখানে আমরা দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করব; ইসলাম আগমনের ঠিক কিছুদিন পূর্বে জাজিরাতুল আরব যার সাক্ষী হয়েছিল।

প্রথম ঘটনা : মক্কায় আবরাহার ব্যর্থ হামলার পর ইয়েমেনে তৈরি হয় রাজনৈতিক সংঘাত, যা পরে এক ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত হয়। এই সংঘাত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে গঠিত শক্তি এবং বহিঃশক্তির মধ্যে। হাবশিরা ইয়েমেনের অঞ্চলগুলোকে দখল করে নিয়েছিল। অপরদিকে পারস্যও তা দখল করতে লালায়িত ছিল। এই সংঘাত সম্মিলিত আরব জাতীয়তার একটা চেতনা তৈরি করতে সক্ষম হয়। যেমন ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাবশার বিরুদ্ধে জয়ের পর আবদুল মুত্তালিব সাইফ ইবনে যি-ইয়াযান আল-হিমইয়ারিকে অভিনন্দন জানাতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। আবুস সালত ইবনে রবিআ সাকাফির মতো, ভিন্ন বর্ণনায় উমাইয়া ইবনে সালত এবং আদি ইবনে যায়েদের মতো আরব কবিরা এই বিজয় নিয়ে কাব্যগাথা রচনা করেছিলেন।[১৪]

দ্বিতীয় ঘটনা : প্রসিদ্ধ যি-কার যুদ্ধ (৬০৯ খ্রি.)। জাজিরাতুল আরবে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মধ্যে নতুন আঙ্গিকে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন—আরবদের এই সম্মিলিত চেতনার পরিপক্ব বহিঃপ্রকাশ ছিল এই যুদ্ধটি। বিশেষ করে পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গোত্রগুলোর এই সম্পর্ক গড়ে তোলা আরও বেশি প্রয়োজন। এই দিনটিকেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৪. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনে হিশাম, আবুল কাসেম আবদুর রহমান খাছআমি সুহাইলি রচিত *আর-রাওজুল উনুফ* হতে উদ্ধৃত, খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৫, ১৬১-১৬২।

চিত্রিত করেছিলেন এভাবে—'এটাই হলো ১ম দিন, যেদিন আরবরা অনারবদের থেকে আলাদা দলে বিভক্ত হয়েছিল।[১৫] আরব ও অনারব সকলে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি দাঁড়াবার ব্যাপারে নবীজির এই উক্তি ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। গোত্রে গোত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের পলিমাটির ওপর ভিত্তি করে যে পরিবর্তনের ধারা দেখা গেছে—সেই পরিবর্তিত প্রকৃতি থেকে ঘটনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে।[১৬]

বিভাজনের কারণ আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, মরুবাসী ও শহুরে—আরবের উভয় সমাজে সামাজিক ঐক্যের ভেতর দিয়েও বিভাজনের অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। গোত্রকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতির ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সদস্যের আগ্রহে ভাটা দেখা দেয়। গোত্রীয় রীতিনীতি কোনো কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে বিভাজনের দেয়াল তৈরি করে রাখে। তো, যেসব গোলামকে আজাদ করে দেওয়া হতো, যারা গোত্রের বংশধারার অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না, তারা পরিণত হতো মাওয়ালি তথা আজাদকৃত গোলাম নামে এক ভিন্ন শ্রেণিতে কিংবা পরিণত হতো গোত্রের অনুসারীতে। একইভাবে কোনো আগন্তুক কবিলায় আশ্রয় গ্রহণ করলে এক বা একাধিক কারণে সেও মূল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। এভাবেই একটি কবিলা ও গোত্রের ভেতর দল ও শ্রেণি গড়ে উঠত। যারা পরিপূর্ণ নিজেদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারত না। এগুলোই হতো বিভাজনের কারণ।[১৭]

এগুলো ছাড়াও সাধারণভাবে একটি সমাজ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকত, যার শীর্ষে থাকত কবিলা বা গোত্রের প্রধান ব্যক্তি। গোত্র কখনো প্রধানের সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারত না। কবিলার কয়েকজন লোক নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ গোত্রপ্রধানকে সহযোগিতা করত। এর অধিকাংশ সদস্য হতো প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিগণ।

---

১৫. *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক* (তারিখে তাবারি), খ. ২, পৃ. ১৯৩।

১৬. *আন-নাযাআতুল মাদ্দিয়্যাহ ফিল-ফালসাফাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ*, হুসাইন মুরুওয়াহ, খ. ১, পৃ. ৩১৪।

১৭. *আল-আরব ফিল উসুরিল কাদিমাহ*, পৃ. ৩৮৪-৩৮৭।

এর ফলে, গোত্রের ভেতরে শ্রেণিবিভাজন গড়ে ওঠে। কারণ, গোত্রের ভেতর যাদের মনে করা হতো সমস্তরের, তাদের সঙ্গে গোত্রের আচরণ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। কেউ কেউ সমতার অভাব অনুভব করত।

আরবসমাজ ইয়েমেনে এই সমতার অভাব দেখতে পায়। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তারা বৈষম্য করে। সেখানে কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি এবং শাসকশ্রেণির বংশধররা মিলে একটি স্বতন্ত্র দল তৈরি করে ফেলে। তারা রাষ্ট্রীয় সবগুলো পদ কুক্ষিগত করে রাখে। একইভাবে সেখানে কৃষক, পেশাজীবী ও সুগন্ধি সংগ্রহকারী শ্রমিক ছিল। সমাজের এই শ্রেণিবিভাজন যুগের পর যুগ পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোনো সদস্য নিজের পেশা পরিবর্তন করে অন্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে—এই সক্ষমতাও ছিল না। সামাজিক জীবনের ক্ষতিকর কিছু বিষয় জাহেলি সমাজে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন : মদ, জুয়া ও অবাধে নারীভোগ। নারীরা ছিল দুধরনের—দাসী ও স্বাধীন। স্বাধীন নারীর চেয়ে দাসীর সংখ্যা ছিল বেশি। তাদের আবাস ছিল নিম্নমানের ঘরে। কোনো আরব কোনো দাসীকে সন্তানের মা বানালে, সেই সন্তানকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিত না। অবশ্য কেউ কেউ সাহসিকতা দেখিয়ে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিত। নারীরা সবসময় অনাচার ও অত্যাচারের শিকার হতো। একবার তালাকপ্রাপ্তা হলে দ্বিতীয়বার পছন্দের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পারত না। বরং জড়বস্তুর মতো উত্তরাধিকার সম্পদ বলে বিবেচিত হতো। অপরদিকে স্বাধীন নারীরা, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। কোনো কোনো বিষয়ে তারা পরামর্শকের মর্যাদা পেত। অনেক কাজে পুরুষের সাথে যৌথভাবে অংশগ্রহণও করত।

বৈবাহিক সম্পর্ক কিছুটা উন্নত ছিল। বিবাহের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মেয়ের পরিবারের সন্তুষ্টি এবং মেয়ের সঙ্গে পরামর্শের পর তার সম্মতি পাওয়া গেলে স্বামী মিলিত হতো স্ত্রীর সাথে। এটাই ছিল বৈধ বিবাহ। পরিবার ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রবাদতুল্য আত্মর্যাদাবোধ থাকা সত্ত্বেও বৈধ বিবাহ বাদে আরবে আরও অনেক ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। যা তাদের অধিকাংশ মানুষ ভালো চোখে দেখত না।[১৮]

---

১৮. আরবের প্রচলিত বিবাহের একটি হলো 'নিকাহুল ইস্তিবযা'। অর্থাৎ দুজন বিবাহিত ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে স্ত্রী বিনিময় করা। আরেক প্রকার বিবাহ ছিল, অনূর্ধ্ব ১০ জন পুরুষ মিলে

অপদস্থতা, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে অশুভ মনে করা এবং জ্যান্ত পুঁতে ফেলা—এসব রীতি জাহেলি সমাজে কোনো কোনো গোত্রের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলন পেয়েছিল। ইসলামপূর্ব আরবদের মধ্যে দাসপ্রথা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম এসে এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করে, যা সময়ের সাথে সাথে দাসপ্রথাকে বাতিল করে দেয়। মুসলিমদের মধ্যে দাস বানানো হারাম করেছে, দাস মুক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। এভাবে ইসলাম দাস তৈরির পথ করে দিয়েছে সীমিত এবং দাসমুক্তির পথ করে দিয়েছে উন্মুক্ত।

ধর্মীয় অবস্থা

ক. শিরকের প্রকাশ

ইসলামের পূর্বে আরব জাতি এক ও অভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আনীত একনিষ্ঠ তাওহিদের ধর্ম মানত তারা, যা পরে ইসলামের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। একপর্যায়ে আরবরা গোমরাহ হয়ে যায়। ফলে সামাজিক পরিবেশের ক্রমপরিবর্তন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিরক তথা অংশীদারত্বের রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে।

তাদের কেউ ঈমান রাখত আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর তাওহিদের প্রতি। কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও দেবতার পূজা করত। কারণ, তারা মনে করত, দেবতার পূজা করলে তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এনে দেবে। মনে করত, উপকার-অপকারের ক্ষমতাও দেবতার অধিকারে রয়েছে। কেউ কেউ আবার ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নি উপাসনার ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আরেক দল কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করত না। আরেক দল বিশ্বাস করত—উপাস্যরা এই দুনিয়াতে মানুষের বিচার করে ফেলে; মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ, পুনরুত্থান—কোনো কিছু নেই।

একজন নারীর সাথে মিলিত হতো। সন্তান প্রসবের পর তাদের একজনকে পিতা হিসেবে নির্ধারণ করা হতো। এ জাতীয় আরও কিছু বিবাহ প্রচলিত ছিল—নিকাহুল খাদান, মুতআ, বদল, শিগার ইত্যাদি। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *বুলুগুল আরব ফি মারিফাতি আহওয়ালিল আরব*, মুহাম্মাদ শুকরি আলুসি, খ. ২, পৃ. ৩-৫।

কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াতের শিরকের প্রকারগুলোর দিকে বিভিন্ন আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

পাথর, কাঠ, খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি নিষ্প্রাণ প্রতিমার পূজা করা। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু গাছকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে সহায়রূপে গ্রহণ করেছিল। গাছ যেন তাদের আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পাইয়ে দেয়—এই উদ্দেশ্যে।[১৯] প্রকৃতির পূজা। যেমন, নক্ষত্রপূজা। এটা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। চন্দ্র, সূর্য ও শুক্র—এই তিন নক্ষত্রকে বলা হতো 'সালুস' বা 'প্রভু নক্ষত্রত্রয়ী'।

আরবের কেউ কেউ বিশ্বাস করত—জিনরা আল্লাহ তাআলার অংশীদার।[২০] একইভাবে ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার শরিক ও তাঁর কন্যা।[২১]

অন্য আয়াতে আছে, আল্লাহ তাআলা ভিন্ন অন্য এক বা একাধিক উপাস্য গ্রহণ করাই হলো শিরক।[২২]

আরও বিভিন্ন পূজার প্রচলন ছিল। ধর্মবিদদের আধুনিক নামকরণ অনুযায়ী যাকে টটেমিজম (Totemism) বলা যেতে পারে। এ হলো মনমগজে গেড়ে বসা আদিম কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস। এর ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে দল বা গোত্রের ওপর। গোত্র বা দলের সদস্যরা পবিত্র একটি ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবে; টটেমিজমের বন্ধন—যা হবে দলটির প্রতীক। আরবরা নিজেদের নাম রাখত বিভিন্ন প্রাণীর নামে। যেমন, বনু আসাদ (সিংহ)। জলীয় প্রাণীর নামেও নাম রাখত। যেমন, কুরাইশ (হাঙর)। বিভিন্ন উদ্ভিদের নামে তারা নাম রাখত। যেমন, হানজালা (আরবীয় একটি ফল, তরমুজের মতো দেখতে। (ইংরেজিতে Colocynth)। পাখির নামে নাম রাখত। যেমন, নাসর (ইগল বা বাজপাখি)। এই নামগুলো যদিও শুভ ধারণার জন্য রাখা হয়েছে; তবে এর দ্বারা আরবদের প্রাণী ও উদ্ভিদকে পবিত্র জ্ঞান করার মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করে।[২৩]

দেব-দেবীর প্রতীক বা মূর্তিপূজার মূল উৎপত্তির ক্ষেত্রে আরও দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। **এক.** ধারণা করা হয়, মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে আমর ইবনে

---

১৯. দেখুন, সুরা যুমার, আয়াত ৩।
২০. দেখুন, সুরা আনআম : আয়াত ১০০।
২১. দেখুন, সুরা সাবা : আয়াত ৪০।
২২. দেখুন, সুরা আম্বিয়া : আয়াত ২৪।
২৩. কিতাবুল ইশতিকাক : ইবনু দুরাইর, পৃ. ৩।

লুহাই আল খুযাইর থেকে। **দুই.** বলা হয়, জাহেলি জীবনের ক্রমপরিবর্তনের ফলে আঞ্চলিকভাবে এটির প্রচলন শুরু হয়।[২৪]

খ. তাওহিদমুখিতা

জাহেলি যুগের শেষদিকের কথা। ইসলাম তখন সমাগত প্রায়। এ সময় আরবসমাজে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বোঝাপড়া-সহ তাওহিদমুখিতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় হিময়ারি সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায়[২৫] তখন ইহুদিধর্ম বেশ প্রচার পায়; বিশেষ করে ইয়েমেনে। ওয়াদিল-কুরা, খায়বর, তাইমা ও ইয়াসরিবে তা প্রসার লাভ করে। একই সময়ে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে বিভিন্ন গোত্রে। উত্তরে তাগলিব, গাসসান ও কুজাআতে; দক্ষিণে ইয়েমেনে। খ্রিষ্টধর্ম আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে জাজিরাতুল আরবে প্রবেশ করেছে দুটি—নাসতুরি ও ইয়াকুবি।

এসব উপাস্য ও বহুত্ববাদী ধর্ম থাকা সত্ত্বেও এর ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ একত্ববাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, জাজিরাতুল আরবে ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মদুটির প্রচার তাদের ধর্মীয় চেতনা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল; বিশেষ করে আল্লাহর অস্তিত্ব, সৃষ্টি, উপাসনা, কিয়ামত ও পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে। দীর্ঘ সময় আরবরা পৌত্তলিক বোঝাপড়া এবং ইহুদি-খ্রিষ্ট চিন্তা-ভাবনার মাঝে বসবাস করেছে। এর ফলে জাহেলি সমাজে উপর্যুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র এক অবস্থান নিয়ে একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটে। তাদের অবস্থান না পৌত্তলিক আর না ইহুদি বা ঈসায়ি; বরং চিন্তার উদ্রেককারী স্বতন্ত্র এক অবস্থান।

এই নতুন ধর্মীয় চেতনার নেতৃত্ব দিয়েছে একদল আলোকিত মানুষ। তারা নিজেদের ধর্মীয় দুরবস্থার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। তারপর এর চেয়ে কিছুটা উন্নত আকিদায় উন্নীত হবার চেষ্টা করেছে। এগুলো তারা উদ্ভাবন করেছে ইহুদি ও ঈসায়ি ধর্মপণ্ডিতদের সংস্পর্শে থেকে। এই লোকগুলো 'আহনাফ' বা একনিষ্ঠ একত্ববাদের অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিল।

---

২৪. এই দুটি বর্ণনা সম্পর্কে জানতে দেখুন, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ৯৯-১০০।

২৫. *তারিখুল ইসলাম আসসিয়াসি ওয়াদদিনি ওয়াসসাকাফি ওয়াল ইজতিমায়ি*, ইবরাহিম হাসান, খ. ১, পৃ. ৭৩,

তাদের মধ্যে আমরা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে পারি। কুস[২৬] ইবনে সায়িদা আল-ইয়াদি, ওয়ারাকা[২৭] ইবনে নাওফাল, উমাইয়া[২৮] ইবনু আবিস সালত এবং উসমান[২৯] ইবনুল হুওয়াইরিস প্রমুখ।[৩০]

---

২৬. কুস ইবনে সায়িদা আল ইয়াদি। জাহিলি যুগের বিশিষ্ট আরব কবি ও নিজ সমকালের বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। কুস ইবনে সায়িদা ভালো বক্তাও ছিলেন। উকাজ মেলায় তিনি নবীজির সাক্ষাৎ লাভ করেন। তবে তিনি ইসলামের যুগ পাননি। কেউ কেউ তাকে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করলেও ইবনুস সাকান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—কুস ইবনে সায়িদা নবুওয়ত আসার পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। [*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ৫/৪১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ] নবীজি থেকে তার নামে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল আসির জাযারি লেখেন, "কুস ইবনে সায়িদা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন, তখনো তিনি নবুওয়ত পাননি"। এটুকু বলার পর সাথে সংশয় জুড়ে দিয়েছেন—"যদি এই বর্ণনা প্রমাণিত হয়ে থাকে আর কি।" [*উসদুল গাবাহ*, ৪/৩৮৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]।—নিরীক্ষক

২৭. ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল আল আসাদি। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযি.-এর চাচাতো ভাই। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহের আলেম ছিলেন তিনি। প্রথম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হয়, ভীতসন্ত্রস্ত নবীজিকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তিনি যে সত্য নবী, পরবর্তী সময়ে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে—এই সবকিছু ওয়ারাকা নবীজিকে জানিয়েছিলেন। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল জাহিলি যুগে ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। তবে তিনি শিরক থেকে মুক্ত হয়ে শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিলেন।
নবুওয়ত আসার পরপর নবীজিকে দেখেছেন বিধায় ইমাম তাবারি, বাগাভি ও ইবনুস সাকান তাকে সাহাবি গণ্য করেছেন। তবে, বিশুদ্ধ মত হলো—তিনি সাহাবি ছিলেন না। নবুওয়তের দায়িত্ব পালন শুরুর দিকেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে হাজারও তাই লিখেছেন—"তাকে সাহাবি গণ্য করায় 'আপত্তি' আছে।" [*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ৬/৪৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]—নিরীক্ষক

২৮. উমাইয়া ইবনে আবিস সালত ছিল জাহেলি আরব কবি। উমাইয়া ছিল পড়াশোনা জানা মানুষ। পূর্ববর্তী কিতাবাদি পড়ার ফলে তার মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। দ্বীনে হানিফ—অর্থাৎ, ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের ধর্ম অনুসরণের চেষ্টা করত। এই চেষ্টার অংশ হিসেবে মদ হারাম করে এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ হলেও কার্যত ইসলাম গ্রহণ করেনি। হিজরি সপ্তম বর্ষে তার ইন্তেকাল হয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লেখেন, সকল জীবনীকার এই বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া ইবনে আবিস সালত কাফের অবস্থায় মারা গেছে। [*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ১/৩৮৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ]—নিরীক্ষক

২৯ পুরো নাম—উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা। উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস ছিল জাহেলি আরব কবি। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ও অন্যদের সাথে মিলে উসমানও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে। এরপর রোম সাম্রাজ্যে চলে গিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। রোমান সম্রাটের সাথে তার একটি মুখরোচক ঘটনাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। অপর

একনিষ্ঠ তাওহিদবাদী—এঁরা অন্যদের তুলনায় চিন্তা ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও উন্নত সভ্যতা পালনে স্বতন্ত্র ছিলেন। তবে তারা প্রত্যেকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক ছিলেন না। একইভাবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনও ছিল না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র একটি ব্যাপক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, যা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। সেটি হলো—মূর্তিপূজা, বহু উপাস্য ত্যাগ ও এক উপাস্যের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। এ ছাড়া তাদের চারিত্রিক আরেকটি বিষয় প্রসিদ্ধ ছিল, সেটি হলো—তারা লোক ও লোকালয় এড়িয়ে চলত। একনিষ্ঠ দ্বীনে ইবরাহিমের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে বেড়াত। তাদের কেউ কেউ আবার ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কিতাব পড়ত। তারা জাহেলিয়াতের নিকৃষ্ট আচার পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিত। যেমন জ্যান্ত কন্যাসন্তান কবর দেওয়া, মদ পান করা ও অবাধে নারীভোগ করা।

ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবর্তনগুলো ঘটার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় ঘটে। সেগুলো হলো : কয়েকটি গোত্র মিলে একটি মূর্তির পূজা করা। এটা আমরা দেখতে পাই খাসআম, বাজিলা, দাউস গোত্রে। তাবালায় অবস্থিত সকল আরব মিলে একটি মূর্তির পূজা করত, যার নাম ছিল জুল-খালাসাহ।[৩১]

হাজিদের খাদ্যব্যবস্থাপনা, জমজমের পানি পান করানো, বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ-সহ হজের আনুষ্ঠানিক সমস্ত দায়িত্ব কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে সেগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর হজের সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যকরী একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল—হজের মৌসুমের সকল কাজ শান্তিপূর্ণভাবে পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের আবশ্যকীয় সহযোগিতা এবং হারাম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকা।

তিনজনের মতো উসমানও ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। বিবরণ থেকে অনুমেয় যে, নবুওয়ত লাভের পূর্বে কিংবা নবুয়তের শুরু যুগেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।—নিরীক্ষক

৩০. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৫৩-২৬৩।

৩১. *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম, খ. ১, পৃ. ১০৭।

এই গোত্রগুলো এমন এক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, বাজার ও হজ-ব্যবস্থাপনা ছিল যাদের রাজতোরণ। তা এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যা একত্ববাদের দিকে তাদের ধাবিত করে।

শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যচর্চার হালহাকিকত

অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইসলামপূর্ব আরবরা ছিল মূর্খ। তারা লিখতে পড়তে জানত না। তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চা ছিল খুব কম, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, 'জাহল' তথা জ্ঞানের বিপরীতার্থক মূর্খতা শব্দ দিয়ে জাহেলিয়াতের ব্যাখ্যা হলো সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। জাহেলিয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নির্বুদ্ধিতা, আহম্মকি, রূঢ়তা ও প্রতারণা ইত্যাদি। এগুলো ছিল জাহেলি সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এ কথা স্পষ্ট যে, ওই যুগে শিক্ষাদীক্ষা আরবের দেশগুলোতে প্রসার লাভ করেনি; বিশেষ করে হিজাজ অঞ্চলে তা আদৌ প্রসার লাভ করেনি। কেননা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে আরবদের আদৌ পরিচয় ছিল না, তবে পুরাতত্ত্ব, কোষ্ঠীধারা, জ্যোতিষশাস্ত্র—ইত্যাদি বিষয়ে তারা ছিল সবিশেষ পারদর্শী। অঞ্চল ও প্রয়োজনভেদে লেখাপড়ার চর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন; যার ফলে লেখাপড়ার প্রসার শহুরে মানুষদের মধ্যে ঘটলেও মরুবাসী আরবদের মধ্যে তা প্রসার পায়নি। মরু আরবরা বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরেই কেবল পড়তে লিখতে শিখত।

আরবদের সাহিত্যচর্চার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মক্কা ও বিভিন্ন মৌসুমি বাণিজ্য মেলায় কবি-সাহিত্যিকদের সম্মেলনের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে আমরা যখন জানতে পারি যে, তারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করত— পার্শ্ববর্তী রোম ও পারস্যের জাতিবর্গের সাথে মিশত। তারা রোম-পারস্য সভ্যতার জৌলুস দেখে প্রভাবিত হতো আর তা প্রতিফলিত হতো তাদের কবিতা, বক্তৃতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীগুলোতে।

বাস্তবতা হলো, বৃহত্তর আরব অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে শিক্ষাদীক্ষা প্রসার লাভ না করা তাদের সাহিত্যিক উত্থানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার প্রমাণ আরবদের কবিতার চমৎকারিতা, যা ধৃত আছে তাদের সাধারণ জীবনযাত্রার বিবরণীতে এবং তাদের মরুজীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে।

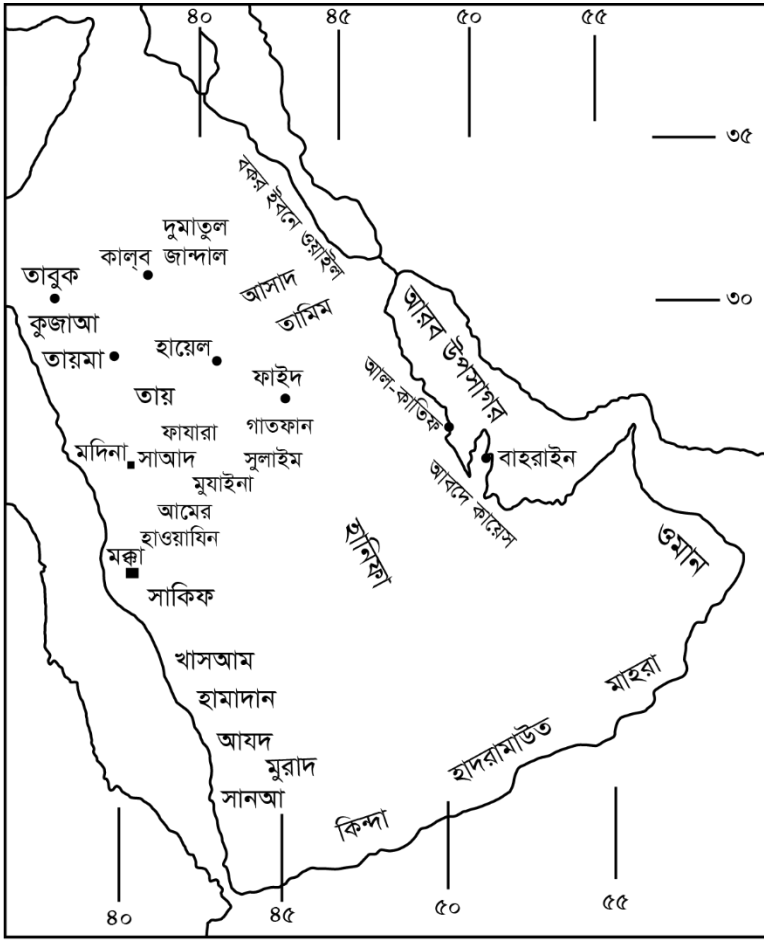

আরব উপদ্বীপে গোত্রগুলোর অবস্থান